শঙ্করদেব

(আসামে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক
ভগবান্ শঙ্করদেবের জীবনচরিত)



শ্রীউমেশচন্দ্র দেব প্রণীত

তৎকর্ত্তৃক
(১৪৭ নং বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত

উৎসর্গ।

বাঙ্গালা বিশ্বকোষ যাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি

পুরাতত্ত্বের উদ্ধারে যিনি অনন্যকর্ম্মা

যাঁহার পাণ্ডিত্য

অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণায় বাঙ্গালী জাতির

মুখ উজ্জ্বল হইতেছে

যাঁহার চেষ্টায়

বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা হইতে

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল

সেই

কায়স্থকুলগৌরব রায় সাহেব

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

মহোদয়ের করকমলে

ইহা সবিনয়ে

অর্পণ করিলাম

প্রণেতা

বিজ্ঞাপিকা

এই 'শঙ্করদেব' নিবন্ধের সহিত আমার একটু সম্পর্ক ছিল—তাই এস্থলে দুএকটি কথার অবতারণা আবশ্যক মনে করিতেছি।

এখন যাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটি শাখারূপে পরিচিত, আজ কিঞ্চিদধিক একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে তাহা গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা নামে সংস্থাপিত হয় এবং আমি ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তদানীং আসাম-তেজপুরপ্রবাসী লেখক মহাশয় আমারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে "শঙ্করদেব" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পাঠ এবং আলোচনার্থে ঐ সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গৌহাটি সাহিত্যানুশীলনী সভার প্রথম বর্ষের কার্য্য বিবরণীতে সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশয়িতব্য তিনখানি গ্রন্থের কথা বিজ্ঞাপিত হয়। প্রথম, "তর্ক-বিজ্ঞান"; ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় "লজিক" বিষয়ে অন্যতর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া বাঙ্গালা পুস্তকের পক্ষে অনন্যসাধারণ গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। দ্বিতীয়, "হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি"; ইহা বিজ্ঞাপনের অল্পসময় পরেই সর্ব্বত্র ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইয়া নানা পত্রিকায় অশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, এবং যাঁহার অর্থব্যয়ে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, হেরম্বরাজমন্ত্রিবংশসম্ভূত সেই উদারমতি ব্যক্তির রাজসম্মান লাভে এই দণ্ডবিধিও বোধ হয় কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছিল। তৃতীয়, "শঙ্করদেবের জীবন-চরিত"; উক্ত বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার সঙ্গে মদীয় সম্পর্কের কিঞ্চিৎ শৈথিল্য নিবন্ধন, তাহা সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতে পারে নাই; তবে রঙ্গপুর পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া কথমপি সঙ্কল্প রক্ষা করিয়া-ছিলাম। সম্প্রতি সুহৃদ্বর্য্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহোদয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় কায়স্থকুলপাবন শঙ্করদেবের এই জীবনচরিত বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক সভার মুখপত্র 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় ঈষৎ পরিবর্ত্তিতাকারে প্রকাশিত হইয়া অধুনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি; বিশেষতঃ আসাম-গৌহাটির সাহিত্যানুশীলনী সভা হইতে না হইয়া কলিকাতাস্থিত বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া যে গ্রন্থের পক্ষে সমধিক শ্লাঘ্য বিষয়, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় অসামীয় মহাত্মবিশেষের জীবনচরিত প্রকাশের প্রযত্ন বোধ হয় এই প্রথম—সমারম্ভঃ শুভায় ভবতু। ইতি

গৌহাটি
বৈশাখ, ১৩২১।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ

শঙ্করদেব।

উপক্রমণিকা। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়” পরবর্ত্তী প্রবন্ধনিচয় নিম্নোদ্ধৃত উপক্রমণিকা সহকারে প্রকাশিত হইয়াছিল,—

“আসামের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ণতা ও অবতারত্বে বিশ্বাসবান্। শঙ্করদেব স্বয়ং কোনও সম্প্রদায়বিশেষের প্রবর্ত্তক নহেন। তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া মহাপুরুষ মাধবদেব “মহাপুরুষীয়” সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। মহাপুরুষীয় পন্থাবলম্বীরা শঙ্করদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌স্বরূপই মনে করিয়া থাকেন। অন্যেরা শঙ্করদেবের তত দূর প্রাধান্য স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং ধর্ম্মের আদি প্রদর্শক, এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না। এই যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মার অনেকগুলি চরিত-গ্রন্থ আছে। এতদ্ভিন্ন তৎসম্বন্ধে আসমীয়, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত অনেক মন্তব্য ও প্রবন্ধাদি প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে শঙ্করদেব সম্বন্ধে মতভেদ অনেক। ইহার প্রধান কারণ, তৎসম্বন্ধে লেখকদিগের মনঃকল্পিত ধারণার অত্যধিক সংমিশ্রণ। শঙ্করদেব সম্বন্ধে মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য আসামের প্রত্নতত্ত্বপারদর্শী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় আমাকে সর্ব্বপ্রথম উৎসাহিত করেন। দুই বৎসর কাল শঙ্করদেব সম্বন্ধে যে কোন ভাষায় যে স্থানে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে বলিয়া

সন্ধান পাইয়াছি, যত দূর সম্ভব, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া ছয়টি প্রবন্ধ রচনা করি। ঐগুলি গৌহাটী-বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হয়। তৎপর ঐ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে সংগৃহীত পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা, ঐগুলির মূলানুসন্ধান ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধ-নিচয়ের সঙ্কলন-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। অভিজ্ঞ লোকদিগের সমালোচনার পর প্রথম প্রবন্ধটির মুদ্রাঙ্কণ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। তৎপরিবর্ত্তে ঐ প্রবন্ধের সিদ্ধান্তগুলি পাদটীকায় মূলের সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং পূর্ব্বের ছয়টি প্রবন্ধ এখন পাঁচটিতে পরিণত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি গৌহাটী-বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভাকর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিতব্য বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে ঐগুলি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় কি না, দেখা আবশ্যক। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে ঐগুলির বহুল প্রচার ও সমালোচনার সম্ভাবনা। যদি এই প্রবন্ধ-দ্বারা শঙ্করদেব সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবধারণের পথ সুগম হয়, তবেই শ্রম সফল মনে করিব।"

পরিষৎ-পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধের কোন কোন অংশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দোষদুষ্ট মনে করিয়া পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই পরিবর্জ্জন-ক্রিয়া এরূপ যদৃচ্ছা-ক্রমে করা হইয়াছিল যে, পরিত্যক্ত অংশের বর্ণিত বিষয়ের অনুল্লেখ হেতু প্রবন্ধপাঠের ক্রমভঙ্গ হইয়াছিল। সুতরাং ঐ পরিত্যক্ত অংশগুলির সংযোজনপূর্ব্বক প্রবন্ধ-নিচয়ের পুনঃ প্রকাশ আবশ্যক মনে করি। শঙ্করদেব-সংসৃষ্ট প্রাচীন পুঁথিতে তাঁহার প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিমত্তা ও ক্রিয়া-কলাপের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে। ঐগুলির ভাষা কিঞ্চিৎ সংযত করা যাইতে পারে; কিন্তু শঙ্করদেব যে তাঁহার প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণদিগকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত এবং কোন কোন ঘটনায় সম্যক্ অপ্রতিভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক সত্যটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রথম প্রবন্ধ।

পূর্ব্বকালে কামতানগর (১) নামে এক রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের অধীশ্বর স্বীয়

---

(১) আসামের ইতিহাসে উল্লিখিত কামতাপুর। পূর্ব্বে সমগ্র কামরূপ রাজ্যও কামতা নামে উল্লিখিত হইত। অনুমানিক ১২৫০।৬০ শকে নীলধ্বজ নামক এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের শেষ হিন্দু রাজা নীলাম্বর ১৪২০ শকে মুসলমানদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপর কোচবংশীয় বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় হয়। তিনি বর্ত্তমান কোচবিহার রাজধানী স্থাপন করেন।

মিত্র গৌড়েশ্বরের নিকট দশ ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ চাহিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর (২) মিত্ররাজ্যের সন্তোষবিধানার্থ চৌদ্দ ঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কায়স্থ লণ্ডাদেব ও পুরোহিত কৃষ্ণপণ্ডিত স্বদেশে প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি ছিলেন। লণ্ডাদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা কনৌজপুর (কান্যকুব্জ) হইতে গৌড়ে আনীত হন। ইঁহারা কামতানগর গমনে প্রস্তুত হইলে পর গৌড়েশ্বর কহিলেন, "তোমরা এই রাজ্যের অলঙ্কার-স্বরূপ; শুধু মিত্ররাজের সন্তোষের জন্যই তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। আশা করি, বৎসরান্তে তোমরা এ দেশে আসিয়া কিছু দিন বাস করিয়া যাইবে।" রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ইঁহারা সকলে কামতানগরে গমন করিলেন। কামতেশ্বর লণ্ডাদেব ও কৃষ্ণ পণ্ডিতের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন এবং ইঁহাদের বাসের জন্য উৎকৃষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ইঁহারা ম্লেচ্ছাদি ইতর জাতি দ্বারা অধ্যুষিত নানা স্থান আতক্রম করিয়া লঙ্গা মাগুরা (৩) নামক গ্রামে উপনিবিষ্ট হইলেন। অন্যেরা যদৃচ্ছাক্রমে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন।

লণ্ডাদেবের সঙ্গে তাঁহার চণ্ডীবর নামে এক পুত্র কামতারাজ্যে আগমন করেন। ইনি পিতৃতুল্য গুণবান্ ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বহু লোকের পালনকর্ত্তা ছিলেন এবং ইঁহার অনেক ধনুর্দ্ধারী পাইক ছিল। কথিত আছে, ৮০ জন ঢালি ইঁহার অনুবর্ত্তন করিত। পূর্ব্বনির্দ্ধারণ অনুযায়ী ইনি বৎসরান্তে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইতে অবহেলা করেন। তজ্জন্য গৌড়েশ্বর কুপিত হইয়া কৌশলে ইঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া কারারুদ্ধ করেন। দৈবাধীন স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ পাইয়া কারাবাস হইতে মুক্ত হন।

নদীয়া হইতে এক পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া গৌড়েশ্বরের রাজধানীতে উপস্থিত হন। এই দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য এক রাশি পুথি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিতেন। গৌড়েশ্বরের সভায় আসিয়া ইনি সদম্ভে বলিলেন, "মহারাজ! আমার সহিত শাস্ত্রবিচারের জন্য যোগ্য পণ্ডিত নির্ব্বাচন করুন।" গৌড়েশ্বর যাহাকে বিচারে নিযুক্ত করেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাহাকেই অবলীলাক্রমে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে সমস্ত নগর শব্দায়মান হইয়া উঠিল। কারারক্ষকদিগের মুখে

(২) গৌড়রাজ্য পূর্ব্ব দিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মালদহের নিকটে গৌড়রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে।

চণ্ডীবর সে সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া তিনি কারাধ্যক্ষকে স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। গৌড়ের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী বিচারে পরাজিত হইলে পর কারাধ্যক্ষ রাজার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! কারাগারে এক বন্দী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছে। তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি অনুমতি করেন, তাহাকে রাজসকাশে উপস্থিত করি।" গৌড়েশ্বর তৎক্ষণাৎ বন্দী চণ্ডীবরকে আনিতে কহিলেন। ক্ষৌরকর্ম্ম ও স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক রাজদত্ত পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া চণ্ডীবর বিচারার্থ সভাস্থ হইলেন। প্রথমে চণ্ডীবর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নিবাস কোথায়?" দিগ্বিজয়ী উত্তর করিলেন, "পতনিপুর (৪)।" চণ্ডীবরের বাস কোন্ গ্রামে জিজ্ঞাসিত হইয়া চণ্ডীবর কহিলেন, গোগরিয়াগ্রামে (৫)। গ্রামের নাম শুনিয়াই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গো শব্দের পুনরুক্তি করিয়া চণ্ডীবরের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। চণ্ডীবরও নিরুত্তর রহিলেন না। তৎক্ষণাৎ পতনি শব্দের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "পতনি অর্থাৎ পান্তা ভাতের জল পড়িলে গোময় দ্বারাই পরিশুদ্ধ করিতে হয়!" এই কথায় সভায় উপস্থিত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক্ ও অধোবদন হইলেন। দৈত্যারি ঠাকুর (৬) লিখিয়াছেন,—

কূটবুদ্ধি কথা দেবীদাসে (চণ্ডীবরের নামান্তর) কহিলন্ত।
আছে শাস্ত্রবাদ এতেকতে জিনিলন্ত।

শাস্ত্রবিচারেও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চণ্ডীবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

রাজদ্বারে সম্মানিত ও রাজদত্ত বহু ধন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া চণ্ডীবর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। চণ্ডীবর দেবীর উপাসক ও পরম ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি ধ্যানস্থ হইলে দেবী তাঁহাকে সশরীরে দর্শন দিতেন। এই হেতু লোকসমাজে ইনি দেবীদাস নামে প্রখ্যাত হন।

(৪) পতনিপুর কোথায় ও এই দিগ্বিজয়ী কে, জানা যায় না।

(৫) গোগরিয়া গ্রাম কোথায় ছিল, জানা যায় না।

(৬) দৈত্যারিঠাকুর ব্রাহ্মণ নহেন, কায়স্থ। শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য গয়াপাণি—দীক্ষার পর নাম রামদাস। তৎপুত্র রামচরণ, তৎপুত্র দৈত্যারিঠাকুর। ইনি ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া 'শঙ্কর ও মাধবদেবের চরিত্র' পুঁথি রচনা করেন। গ্রন্থরচনাকালে শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি প্রধানতঃ মাধবদেবের শিষ্য গোবিন্দ আতৈ এবং স্বীয় পিতা রামচরণের মুখে শুনিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। মহকুমা বড়পেটায় অন্তর্গত বায়ুনা সত্রে দৈত্যারিঠাকুরের বংশ আছেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত গুরুচরিত্র পুঁথি অধুনা ভবানীপুর সত্রে রক্ষিত হইতেছে শুনা যায়।

স্বদেশে কিয়ৎকাল পরম সুখে বাস করিয়া চণ্ডীবর কামতারাজ্যে যাত্রা করিলেন। নৌকায় ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া যাইতে যাইতে লৌহিত্যের উপকূলে টেম্বুয়ানিবন্ধে (৭) বাসোপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমি দেখিয়া, তন্মধ্যবর্ত্তী বটদ্রবা নামক স্থানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেন। চণ্ডীবরের বংশে বটদ্রবা গ্রামে **শ্রীমন্তশঙ্করের** জন্ম হয়।

চণ্ডীবরের মহদ্‌গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া কামতেশ্বর ইঁহাকে শিরোমণিভূঞা (৮) নিযুক্ত করেন। চণ্ডীবরের পুত্র রাজধর। ইনিও ভূঞাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। ইঁহার যশঃ ও খ্যাতি বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহার চারি পুত্র,—সূর্য্যবর, হলায়ুধ, জয়ন্ত ও মাধব। সূর্য্যবরের পুত্র কুসুম; তৎপুত্র শ্রীমন্তশঙ্কর। হলায়ুধের সন্ততির উল্লেখ নাই। জয়ন্তের পুত্র শতানন্দ, তৎপুত্র জগদানন্দ। ইনি আসামরাজ কর্ত্তৃক **রামরায়** নামে অভিহিত হন।

মাধবের পুত্রের নাম অজ্ঞাত, তৎপুত্র **রতিকান্ত দলৈ**। লণ্ডাদেবের পুরোহিত কৃষ্ণ পণ্ডিত কামতা রাজ্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণপণ্ডিতের পুত্র যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র নরোত্তম। নরোত্তমের পুত্র মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র চতুর্ভুজ। ইঁহারই পুত্র **রামরাম গুরু**।

সূর্য্যবর ভূঞা-শ্রেষ্ঠ রাজধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তৎপুত্র কুসুম—কুসুমগিরি নামে পরিচিত। ইনি ভূঞাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঢ্য ছিলেন এবং শিরোমণি ভূঞারূপে প্রখ্যাত হন। ইঁহার সম্বন্ধে দৈত্যারিঠাকুর লিখিয়াছেন,—

সন্তজন রঞ্জন গঞ্জন দুষ্টজন।
গৌরবর্ণ শরীর পরম সুশোভন ॥
তান গুণ গান কিবা কহিব সাক্ষাৎ।
শঙ্কর স্বরূপে কৃষ্ণ অবতার যাত ॥

(৭) এই স্থান আধুনিক নগাও জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী। ব্রহ্মপুত্র এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। বরদোয়ার মহাপুরুষীয় সত্র বিখ্যাত।

(৮) ভূঞারাই রাজাধীনে থাকিয়া দেশ শাসন ও সীমান্তরক্ষা করিতেন। ভূঞাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতাপশালী, তিনিই 'শিরোমণি ভূঞা' হইতেন। আসামে বার ভূঞার উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যবিধ মতও প্রচলিত আছে। "আদি ভূঞার চরিত্র" নামক প্রাচীন পুঁথিতে উক্ত হইয়াছে, লক্ষ্মীমপুরের রাজমন্ত্রী মনোহরের কন্যার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে সুমন্ত্র ও শান্তানুর জন্ম হয়। ইঁহাদের এক জন শাক্ত ও একজন বৈষ্ণব। প্রত্যেকের দ্বাদশ পুত্র বার ভূঞা নামে খ্যাত হন। বৈষ্ণব সুমন্ত্রের বংশে শঙ্করদেবের আবির্ভাব হয়। 'আদিভূঞার চরিত্র' মহাপুরুষীয়-দিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে। উহা অনিরুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

কুসুমগিরি পরম শিবভক্ত ছিলেন। পুত্র কামনায় তিনি বহুকাল নিষ্ঠা সহকারে বিবিধ বিধানে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করেন। দৈত্যারিঠাকুর বলেন, শঙ্করের বরে পুত্রলাভ করিয়া, কুসুমগিরি পুত্রের শঙ্কর বা গদাধর এই নামকরণ করেন। কিন্তু কণ্ঠভূষণ (৯) লিখিয়াছেন, কুসুমগিরির ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং শঙ্কর শঙ্কররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হন (১০)। একদা রজনীতে কুসুমপত্নী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন,—

জটাজূট শিরে শোভে অর্দ্ধচন্দ্রকলা।
গলত শোভয় মনুষ্যর মুণ্ডমালা ॥
কটীত বাঘর ছাল সর্প অলঙ্কার।
ভস্মে বিভূষিত অঙ্গ দেখি চমৎকার ॥
মহাভয় হুয়া সতী চাহিয়া আছন্ত।
দিয়া তযুগৃহে স্থান মহেশে মাগন্ত ॥—কণ্ঠভূষণ, ২ পৃঃ

অচিরে সতীর স্বপ্ন সফল হইল—গর্ভের লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল। কুসুমগিরির আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সন্তান-লাভের আশায় নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

কাল পূর্ণ হইলে শুভ দিন, শুভ ক্ষণ ও শুভ নক্ষত্রের সম্মিলন হইল। কুসুমগিরির পত্নী পুত্ররত্ন প্রবস করিলেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মেঘসকল মৃদু গর্জ্জন করিল। অশ্বগণ উচ্চৈঃস্বরে হ্রেষারব করিল। মরি মরি, শিশুর কি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় রূপ! তমোময় অর্দ্ধনিশীথে সুতিকা-গৃহটি শিশুর দেহনিঃসৃত প্রখর জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া কুসুমগিরি সর্ব্বাগ্রে স্নান করিলেন; পুত্রের কল্যাণোদ্দেশে বহু দান-দক্ষিণাদি স্বকুলোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন; ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ও জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিলেন। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া কহিলেন

(৯) কণ্ঠভূষণ শঙ্করদেবের চরিত্রলেখক। ইঁহার পিতামহ দ্বিজ চক্রপাণি শঙ্করদেবের প্রভাবকালে সশিষ্য বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র বৈকুণ্ঠ, তৎপুত্র দ্বিজভূষণ। ইনি প্রহ্লাদোপম কৃষ্ণভক্ত নারায়ণদাসের পুরোহিতবংশীয় ছিলেন এবং তঁাহারই মুখে শঙ্কর-চরিত-কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনাকালে শঙ্করদেবের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন ইঁহার বংশে কেহ আছেন কি না, জানা যায় না। ইঁহার সাচিপাতে লিখিত যে পুঁথি আমরা দেখিয়াছি, তাহা ৩০০ শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

(১০) মাধবদেব স্বরচিত গুরুভটিমতে লিখিয়াছেন, "জগজনতারণ দেবনারায়ণ শঙ্কর তাকেরি অংশ।" বৈষ্ণবকীর্ত্তন।

শিশু অতি শুভ লগ্নে জাত হইয়াছে এবং উত্তরকালে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী, জ্ঞানী, ধীর, শুদ্ধমতি ও পরম পণ্ডিত হইবে।

সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত শিশু দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। এই নয়নমনোহর শিশুর সমাগমে শিরোমণি ভূঞার নিরানন্দময় গৃহ আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। কুসুম আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণ তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এখন ভাগ্যলক্ষ্মী কুসুমগিরির প্রতি অনুকূলা হইয়াছেন। কালক্রমে তিনি আর একটি পুত্র লাভ করিলেন। ইনিই উত্তরকালে বলগাভাগিরি নামে প্রসিদ্ধ হন।

অধিক বয়সের সন্তান পিতা-মাতার অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। দশ বার বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শঙ্করের বিদ্যারম্ভই হইল না (১১)। সমবয়স্ক বালকেরা বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল আর শঙ্কর ক্রীড়া-কুর্দ্দনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। খেলিতে গেলে তাঁহার আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। ভোজনে বসিয়া কুসুমগিরি অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। ক্রীড়াস্থল হইতে বালককে ধরিয়া আনিতে হইত :—

ধূলি ধূসরিত তনু রাতুল পরাই।

ধূলিলিপ্ত সোনার পুতুলটির ন্যায় শঙ্করকে ধরিয়া আনিয়া যখন অঙ্গনে দাঁড় করান হইত, তখন তাঁহাকে দেখিয়া পরিজনের প্রাণ উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। পরিজনেরা স্নান করাইয়া বালককে পিতার সহিত ভোজনে বসাইয়া দিতেন।

ক্রীড়ায় কোন বালকই শঙ্করের সমকক্ষ ছিল না।

ঢোপ ঘিলা খেরি দলি যুদ্ধ খেলায়ন্ত।
মোক ছুইবি বুলি কতো বেগে লড় দেন্ত॥
ছুইবি বুলি কত শিশু লগতে লররে।
আচোক ছুইবেক কতোদূর পাছে পড়ে॥
হাসিয়া উলটি আসি সাবটি ধরন্ত।
কতো হাতাহাতি বাহুযুদ্ধ খেলায়ন্ত॥

(১১) দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, অতি শৈশবে শঙ্করের পিতৃ-মাতৃবিয়োগ হয় ও তাঁহার পিতামহী বুড়ী গোসানী শঙ্করকে মানুষ করেন। এই কথাটি সম্ভবতঃ তাঁহার লিখা হইতেই মহাপুরুষীয় সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। দৈত্যারিঠাকুর শঙ্কর-মাধব-সম্মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং কণ্ঠভূষণ হইতেই এই সময়ের সবিস্তার বিবরণ গৃহীত

বালরোজলে নামিয়া যখন সাঁতারিয়া খেলা করিত, তখন কোন বালকই শঙ্করের ন্যায় অধিক ক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকিতে পারিত না। দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইলে কেহই শঙ্করের অগ্রে যাইতে পারিত না। বটা চরাই (পক্ষি-বিশেষ) ধরিতে গেলে অন্য বালকেরা একটিও খুঁজিয়া পাইত না। শঙ্করের হাতে দুই চারিটি ধরা পড়িত। কিন্তু এই ক্রীড়াশীল বালক পাখী ধরিয়া আনিয়া তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত না। খেলা শেষে সমস্ত পাখী উড়াইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিত। কুকুর-শাবক ধরিয়া আনিয়া বাসা দিয়া রাখিত। পাছে শীতে কষ্ট পায়, এই জন্য শাবকগুলিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিত।

বিদ্যাশিক্ষায় পুত্রের অযত্ন দেখিয়া কুসুমগিরি অপ্রসন্ন ও চিন্তিত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষায় পুত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্য এক দিবস অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন, "বাছা! তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি পরম পণ্ডিত হইবে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। আমার বংশে পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণ সকলেই বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন এবং বিচারে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে, সেই মহদ্বংশের মধ্যে তুমিই মহামূর্খ হইবে।" কথাগুলি শঙ্করের মর্ম্মস্পর্শ করিল। চঞ্চলমতি বালক তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "আমায় পাঠশালায় যাইতে দিন, আমি পড়িতে পারি কি না, দেখিতে পাইবেন।" এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কুসুমগিরি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং কহিলেন :—

ধন্য ধন্য বাপু তুমি কুলর নন্দন।
পড়িবাক শুনি মোর তুষ্ট ভৈলা মন॥
রূপ যৌবন যদি কুলবন্ত হয়।
বিদ্যাহীন ভৈলে বাপু কিছু ন শোভয়॥
আন ধন ধান্যর ভ্রাতৃয়ে বণ্টা লয়।
বিদ্যাধন মহারত্ন নিবে না পারয়॥
দানে ক্ষয় ন যাইবে চোরে না পারে নিবাক।
স্বদেশত পুজে মাত্র মহন্ত রজাক॥
বিদ্যাবন্ত পুরুষক পূজে সর্ব্ব ঠাই!
বিদ্যা যে ভূষণ বাপু অধিকে সহাই॥

কুসুমগিরির অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তীক্ষ্ণধী বালক শঙ্করের প্রতিভা স্রোতো-গতি

পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাবী মহত্বের পথে প্রধাবিত হইল। যে সকল শাস্ত্রকার হিন্দুজাতির চিরকল্যাণের জন্য এই নীতিবাক্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লেখনী জয়যুক্ত হউক।

কুসুমগিরি স্বয়ং শঙ্করকে গুরু-গৃহে (১২) লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের দ্বারা শুভ দিন, বার, নক্ষত্রাদি দেখিয়া শঙ্করের পাঠ আরম্ভ করাইয়া দিলেন। বালকের পাঠানুরাগ ও উজ্জ্বল প্রতিভা গুরুর বিস্ময় উৎপাদন করিল। গুরু প্রত্যহ যে পাঠ দেন, বালক তাহা অপেক্ষা অধিক শিখিয়া আসে। দ্রুতগতি পাঠশালার ছাত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া শঙ্কর অগ্রগামী হইলেন। অন্য বালকেরা এক একখানি করিয়া পুঁথি পড়িত, শঙ্কর দুই দুইখানি করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শুনিয়োক তান যেন পড়িবার রীতি।
শয্যার দুই পাশে লগায়ন্ত দুই বাতি॥
দুখান ঠগিত দুই পুস্তক থয়ন্ত।
দু গোটা সফুরা ভরি তাম্বুল লয়ন্ত॥
ডাহিনের সফুরাত ভুঞ্জি তাম্বুলক।
ঠগির পুস্তক মেলি পড়ন্ত শ্লোকক॥
তেহ্ন মতে বামর পুস্তক মেলি চান্ত।
প্রভাতে উঠিয়া পুনু ছাত্রশালে যান্ত॥

পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। শঙ্কর কত কাব্য ও কোষ অধ্যয়ন করিলেন—চৌদ্দ শাস্ত্র (১৩) পাঠ করিলেন—পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ ব্যাখ্যা করিলেন। গুরুর বিদ্যা নিঃশেষ হইল, তিনি শঙ্করকে "বিজয়ী পণ্ডিতমল্ল" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শঙ্কর এখন আর বালক নহেন। তরুণ যৌবনের সহিত পাণ্ডিত্যের সম্মিলনে তিনি অতি মধুরদর্শন হইয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীমন্ত শঙ্কর গৌর কলেবর চন্দ্রযু যেন আভাস।
বৃহস্পতি সম পণ্ডিত উত্তম যেন শূর পরকাশ

(১২) কণ্ঠভূষণ বা দৈত্যারিঠাকুর ইঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। পরবর্ত্তী চরিতগ্রন্থাদিতে ইনি পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

(১৩) চৌদ্দ শাস্ত্র যথা—শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, মীমাংসা, ন্যায়, দণ্ড, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ, ছন্দ, স্মৃতি, নিরুক্ত, গান্ধর্ব্ব, ধনুর্ব্বেদ ও কাব্য।

ছত্রাকৃত মাথ শোভে কেশ তাত কপোল সুষম আতি।
নাসিকা সুন্দর অধর রাতুল দশন মুকুতা-পান্তি॥
পদ্মপুষ্প সম বদন প্রকাশৈ সুন্দর ঈষৎ হাসি।
গম্ভীর বচন মধু যেন শ্রবৈ নব পঙ্কজর পাসি॥
কর্ণ দুই খান পরম সুঠাম প্রকাশে তেম কুণ্ডল।
গল কম্বুকণ্ঠ সুন্দর রুচির বহু লয়ে বক্ষঃস্থল॥
আজানু-লম্বিত দুই খান ভুজ সুন্দর পরম পুষ্ট।
সুবর্ণর টার বলয়া আঙ্গুঠি দেখন্তে মন সন্তুষ্ট॥
বহল হৃদয় হার প্রকাশয় গায়ত পাট পাসরি।
হিঙ্গুলিয়া ভূনি কটিত প্রকাশৈ শোভে নীল বর্ণোপরি॥
উরু জানু জঙ্ঘা চরণ সুঠান গজর সম গমন।
গুণে গুণবন্ত মহামান্যবন্ত সমস্তে লোক রঞ্জন॥
মহাবশী ধীর যৌবন শরীর রূপে নোহে কেহো সরি।
শঙ্করর নাম কেহো ন কাঢ়য় বোলে সবে ডেকাগিরি॥

এই রূপবান্ গুণবান্ যুবকের সম্ভ্রম-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ইঁহাকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকিত না। সকলে ডেকাগিরি বলিয়া আহ্বান করিত। ডেকাগিরি শাস্ত্র-পাঠ ও শাস্ত্রালোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুরোহিত ও সহপাঠী রামরাম গুরু সর্ব্বত্র তাঁহার অনুষঙ্গী ছিলেন। উভয়ে সতত শাস্ত্রচর্চ্চা ও বিতর্ক করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিতেন। ক্রমে শঙ্কর যোগাভ্যাস (১৪) আরম্ভ করিলেন। কঠোর সাধনার দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান বায়ু বশীভূত করিলেন। ধ্যান, ধারণা, সমাধি, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির সাধন করিলেন। কথিত আছে, যোগাভ্যাসে তিনি এরূপ সিদ্ধি লাভ করেন যে, শ্বাসরোধ করিয়া তিনি চারি দিবস বসিয়া থাকিতে পারিতেন। জলের ভিতরে ডুব দিয়া দীর্ঘ-কাল থাকিতেন, বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন। যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহার দেহশ্রী আরও সুন্দর ও সুগঠিত হইয়া উঠিল। তথনও তাঁহার বাল্য-চপলতা দূর হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গিয়া তিনি রামরাম গুরুকে কহিলেন, "গুরো! চল, ব্রহ্মপুত্র সাঁতরাইয়া পার হই।" তৎক্ষণাৎ নৌকা সজ্জিত হইল; সকলে ব্রহ্মপুত্রে নামিয়া সাঁতার দিলেন। নৌকা পিছু পিছু চলিতে লাগিল। একজন দুই জন করিয়া সকলেই নৌকায় উঠিয়া

(১৪) গুরু কে জানা যায় না।

পড়িলেন। কেবল শঙ্কর ও রামরাম গুরু সাঁতরাইয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। শঙ্কর শুধু পার হইলেন, এমন নহে, সাঁতারিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন! রামরাম গুরুও তত দূর সাহস করিতে পারিলেন না।

পুত্রের 'রূপ গুণ বিদ্যা গতি, বয়স আকৃতি মতি' সর্ব্বজন-প্রশংসিত দেখিয়া কুসুমগিরি শঙ্করের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর নূতন কুটুম্বের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া পুত্রের সদৃশ বধূ গৃহে আনিলেন।

দিন দিন ডেকাগিরি অতি লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পট্ট উত্তরীয় ধারণ করিয়া, সুগন্ধি চন্দন অনুলেপন করিয়া, মস্তকে মালতী পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া ডেকাগিরি যখন পথে বাহির হইতেন, পথিকেরা অগ্রগামী হইয়া তাঁহার চরণে নমস্কার করিত। এই মহারূপের প্রভাব দেখিয়া পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও অবনত হইতেন। এই তেজস্বী দিব্যদর্শন যুবককে পরম পণ্ডিত জানিয়া, পাছে তৎসহ বিতর্ক উপস্থিত হইলে লজ্জা পাইতে হয়, সেই ভাবিয়া ব্রাহ্মণেরাও আশীর্ব্বাদ করিয়াই শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিতেন। ডেকাগিরি কাহাকেও একটা রূঢ় কথা বলিতেন না, সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ না করিয়া কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতেন না।

এক দিন ডেকাগিরি পথে চলিয়াছেন। এক ভৃত্য ঝারি ও কম্বল লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি এক সোজাপথে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বারণ করিল; কহিল, "প্রভো! এই পথে যাইবেন না। এই পথে মহিষের ন্যায় ভয়ঙ্করমূর্ত্তি এক ষাঁড় আছে, পথিক দেখিলেই এই বিকটাকার জন্তুটা ভীষণ বেগে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহার ভয়ে কেহ এই পথে আসে না।" শুনিয়া ডেকাগিরি কহিলেন, "আমি পথিকদিগের ভ্রমণের বিঘ্ন দূর করিব।" এই বলিয়া তিনি অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন, মস্তক আন্দোলন করিয়া ষাঁড়টা ভীষণ বেগে আসিতেছে। লম্ফ দিয়া ডেকাগিরি ষাঁড়ের শৃঙ্গ ধরিলেন।

শরীরর বলে আটি ধরিলা মেরাই।
করে ছটফট যাইতে না পারে এড়াই॥
গাবর সন্ধানে মুণ্ড উচাট্টু করিল।
আছোক এড়াইব লারিবাকো ন পারিল॥
টান করি পৃথিবীত ধুখুরি থৈকচি।
ঘাড় পাক দিয়া ডাক পেহলাইলা হেচুকি।
মর মর করি হাড় ঘারর ভাঙ্গিল।
মহা পীড়া পাইয়া মুত্র পুরীব এড়িল॥

পাচুয়াই কতো দূরে পড়িলেক যাই।
যেন অরিষ্টক কৃষ্ণে পেহলাইলা তুনাই॥

এইরূপে ষণ্ডের দমন করিয়া ডেকাগিরি এই পথ নিষ্কণ্টক করিলেন। পথিকেরা নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে লাগিল। ইহার পর "ডেকাগিরি আসিতেছে" এইমাত্র বলিলেই যণ্ডবর ভয়ে দৌড়িয়া পলাইত।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে পর কুসুমগিরি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্করের জীবনে এই প্রথম শোকের আঘাত পড়িল। তিনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া পিতার যথাবিধি সৎকার করিলেন, দশ দশা করিয়া, যথাশাস্ত্র শুদ্ধ হইলেন। পিতার স্বর্গকামনায় বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ করিলেন, বহু দান ও দক্ষিণার দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন, জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইলেন।

অনতিবিলম্বে শঙ্কর-জননীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। এইটি শোকের দ্বিতীয় আঘাত। শঙ্কর শাস্ত্রদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত হৃদয় স্নেহময়ী মাতার বিয়োগে আলোড়িত হইল। তিনি বিধি-ব্যবহারে মাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করিলেন; আর ভাবিতে লাগিলেন,—

নুহিকে স্থায়িত্ব ইতো অনিত্য সংসার।
কৈর পিতৃ মাতৃ বন্ধু পুত্র পরিবার॥
কৈর পরা জীব আসি হোয়ে এক ঠাঁই।
ধরয় সম্বন্ধ পিতৃ মাতৃ খুড়া ভাই॥

তত্ত্বজ্ঞানের একটা মর্ম্মান্তিক আলোড়ন আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু শঙ্কর সংসারের প্রধান আকর্ষণ এড়াইতে পারিলেন না। পরম গুণবতী ভার্য্যার যত্ন ও আনুগত্য তাঁহাকে সংসারের দিকে টানিয়া রাখিল। তিনি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাঁহার এক কন্যা জন্মিল। তিনি মনের আনন্দে কন্যার মনু নাম রাখিলেন। কন্যা বয়স্থা হইলে কায়স্থকুলোদ্ভব হরি নামক এক সচ্চরিত্র যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। আর সন্তানাদি হইল না।

কথিত আছে, ভগবান্ যাহাকে কৃপা করেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার সংসারে বন্ধনস্বরূপ প্রিয়জনদিগকে হরণ করিয়া থাকেন। এক একটি প্রিয়জন চলিয়া যায় আর সংসার-সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত মানব ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যিনি প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, তাঁহার নিকট যাইতে চায়। প্রাণের সমস্ত আবেগ একীভূত করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাকে। যাঁহাকে ভুলিয়া আত্মহারা জীব সংসারে খেলা-ধূলায় নিমগ্ন ছিল, ব্যাকুল

হৃদয়ে তাঁহাকে স্মরণ করে। বিপৎসম্পাতে বৈষ্ণবদিগের মুখে এই পদটি প্রায়ই শুনা যায় :—

যে করে তোমার আশ।
কর তার সর্ব্বনাশ ॥
তবু করে তোমার আশ।
হও তার দাসের দাস ॥

ভগবান্, শঙ্করের সর্ব্বনাশ করিলেন। যে পত্নীর প্রেমডোরে তিনি বাঁধা ছিলেন,—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হেতু সংসার অনিত্য ও দুঃখময়, ইহা বুঝিয়াও তিনি যাহার মমতায় আকৃষ্ট ছিলেন, ভগবান্ তাহাকে এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া লইলেন। শঙ্করের পত্নী শঙ্করকে ত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। শঙ্করের সংসারের বাসাঘরটি ভাঙ্গিয়া পড়িল—বৈরাগ্যের উদয় হইল।

উদাস মনে শঙ্কর, পত্নীর শবদেহের সৎকার করিলেন, পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন। পিতার মৃত্যুতে যে আগুন ধরিয়াছিল, মাতার মৃত্যুর পর যাহা ধূমায়মান হইয়া জ্বলিতেছিল, এইবার তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধনসম্পত্তি শঙ্কর দুই হাতে বিলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। হৃষ্টপুষ্ট বৎস সহ তিন শত ধেনু ছিল, তাহা রাখালদিগকে দান করিলেন—চাষের জন্য ষাটি জোড়া বলদ ছিল, তাহা বিতরণ করিলেন। অন্য সম্পত্তি সমস্ত খুল্ল-পিতামহ জয়ন্ত ও মাধবকে সমর্পণ করিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জামাতা হরির গৃহে রাখিয়া, তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশ্যে শঙ্কর স্বদেশ ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

স্বজন-বিয়োগে পাশমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় শঙ্করদেব গৃহ ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত সংসার-ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে :—

দ্বাদশ বৎসর তীর্থ করি ফুরিলন্ত।
অনন্তরে আসি নিজ গৃহক পাইলন্ত ॥

এই দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি কোন্ কোন্ তীর্থে কত কাল বাস করিয়াছিলেন, তাহার কোনও বিবরণ পায়া যায় না। তাঁহার চরিতগ্রন্থগুলিতে তৎকর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন ও কিয়ৎকাল বাসের কথা ব্যতীত বিশেষ কিছুই লিপিবদ্ধ হয় নাই।

তৎকালে শ্রীক্ষেত্র যাইতে দুই মাস-সময় লাগিত (১৫)। তীর্থযাত্রিগণ শ্রীক্ষেত্রে চতুর্ম্মাস্য অর্থাৎ বর্ষার চারি মাস যাপন করিতেন। তীর্থপর্য্যটনমাত্র উপলক্ষ হইলে শঙ্করদেবের জগন্নাথ-দর্শন, শ্রীক্ষেত্রবাস ও স্বদেশ প্রত্যাগমনে এক বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইত না। কিন্তু তীর্থদর্শনমাত্র মূলতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এই সময়ে শঙ্করদেব ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমস্তই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৎকালে মুসলমান-প্রাধান্য হেতু ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাংশে হিন্দু তীর্থ-যাত্রীর গতায়াত বিশেষ ছিল না। উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন হিন্দু ভূপতিগণ রাজত্ব করিতেন, সুতরাং তথন দলে দলে হিন্দু তীর্থ-যাত্রিগণ ঐ সকল রাজ্যেই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১ বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে তৎকালে দর্শনীয় স্থানগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্করদেব শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিলেও যে স্থানে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন ইহাতে সংশয় নাই।

এই সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন, কি করিয়া ছিলেন, তৎসমস্ত জানা অতি আবশ্যক। কারণ, এই তীর্থভ্রমণকালীন শিক্ষা ও ভূয়োদর্শন তাঁহাকে স্বদেশের ধর্ম্মসংস্কারে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই গ্রন্থদ্বয়ের অশেষ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শঙ্করদেব প্রধানতঃ এই গ্রন্থদ্বয় হইতেই স্বীয় ধর্ম্মমত আহরণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় শঙ্করদেব কোথায় পাইলেন, কণ্ঠভূষণ তাহার উল্লেখ করেন নাই। দৈত্যারিঠাকুর লিখিয়াছেন, জগন্নাথ, এক অজ্ঞাতনামা বিপ্রের দ্বারা শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রেরণ করেন। গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হইলে ঐ বিপ্র প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ ইনিই কণ্ঠভূষণ-বর্ণিত ত্রিহুতদেশীয় ব্রাহ্মণ জগদীশ মিশ্র। কিন্তু কণ্ঠভূষণ লিখিয়াছেন, জগদীশ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শঙ্করদেবকে পাঠ করিয়া শুনাইতে আসিয়া দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বেই শঙ্করদেব ঐ গ্রন্থের পদ রচনা করিয়া

(১৫) কণ্ঠভূষণের গ্রন্থে এ কথার প্রমাণ আছে। জগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এক ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শঙ্করদেবকে পাঠ করিয়া শুনাইতে আসেন। তিনি শঙ্করসন্নিধানে আসিয়া বলিতেছেন,—

দুই মাস পূর্ণ ভৈলেক পথত আসিলোহো রঙ্গমনে।
মহাভাগ্য মোর মিলিল তোমাক দেখিলো আমি নয়নে ॥

রাখিয়াছেন। সুতরাং জগদীশ মিশ্রের নিকট শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

গীতা-শাস্ত্র সম্বন্ধে দৈত্যারিঠাকুর এক অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ গ্রন্থ শঙ্করদেব ব্রহ্মপুত্র গর্ভে প্রাপ্ত হন এবং উহার স্পর্শে তাঁহার একটি ছিন্ন কর্ণ জোড়া লাগিয়া যায়।

এই সকল বৃত্তান্ত হইতে প্রকৃত সত্য অবধারণ করা সুকঠিন। প্রাচীন কামরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের বীজভূমি। এই কামরূপে বহু তন্ত্র ও উপপুরাণ রচিত হইয়াছিল। শঙ্করদেবের সমকালে কামরূপের ব্রাহ্মণসমাজে শিক্ষাবিষয়ে দৈন্য পরিলক্ষিত হইলেও এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই যে, গীতা ও ভাগবত তৎকালে এ দেশে সম্যক্ অপরিজ্ঞাত ছিল। গ্রন্থ ছিল বটে, কিন্তু চর্চ্চা ছিল না। তীর্থভ্রমণের পর দেশে আসিয়া শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতের পদরচনা ও উহার প্রচারে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তীর্থভ্রমণকালে শঙ্করদেব শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত গঠন করিয়াছিলেন।

আসামের বৈষ্ণব-সাহিত্য আমরা যত দূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে শ্রীক্ষেত্র ব্যতীত অন্য অন্য তীর্থের বিশেষ বিবরণ কিছুই দেখিতে পাই নাই। তৎকালে আসাম হইতে দলে দলে তীর্থযাত্রিগণ শ্রীক্ষেত্র যাইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কেহ কেহ অধ্যয়ন-মানসে কাশীতে যাইতেন, কেহ কেহ গয়ায় পিণ্ডদান করিতে যাইতেন, এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং আসামের বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোড়ন করিয়া শঙ্করদেব কোথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হইবে না।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে তদানীন্তন প্রধান প্রধান তীর্থ এবং কোন্ কোন্ স্থান কোন্ কোন্ শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্দ্বারা এইরূপ প্রতীতি হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত চর্চ্চা অতি অল্প স্থানেই হইত। তখন প্রধান প্রধান শিক্ষার কেন্দ্রভূমিতে দর্শন ও বেদান্তের চর্চ্চাই বিশেষ প্রবল ছিল। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তৎকালে—

গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাই তাহার জিহ্বায়॥

বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্য ব্যতীত বৈষ্ণব-প্রভাব তখন অন্যত্র ছিল না বলিলেই হয়। বৃন্দাবন ত তখন বিজন অরণ্যে পূর্ণ। মথুরাও মুসলমানদিগের অত্যাচারে বিধ্বংশপ্রায়। শঙ্করদেবের—

দৈবকীনন্দন এক বেদমাত্র শাস্ত্র এক
দৈবকীনন্দনে কৈলা যাক (১৬)।

ইত্যাদি উক্তি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, শঙ্করদেব বেদ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এক বেদবিহিত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, দৈবকীনন্দনের সহিত বেদের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। বেদের 'কৃষ্ণ' একজন ঋষি মাত্র। বেদের সহিত না হইলেও বেদান্তের সহিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য রচিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কোন সুস্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্য 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' নামক বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া অপর সম্প্রদায়ের মত গঠন করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মূল কাণ্ডগুলি শাখা-প্রশাখা সহকারে দক্ষিণ ও মধ্যভারতে কিছু কিছু বিস্তৃত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে বর্ত্তমান আকারে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। শঙ্করদেব খৃষ্টীয় ১৪৪৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে মূল শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার জন্মের ২০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইলে পর উহার ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতানুসারিণী টীকারও রচনা আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে শ্রীধর স্বামীর টীকাই আসামে ও বঙ্গদেশে সমধিক প্রচলিত দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য-সংসৃষ্ট সাহিত্যে দেখা যায় যে, শ্রীধর-স্বামীর টীকা শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রিয় ছিল। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য শ্রীধর-স্বামীর টীকা মানেন না বলাতে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত, ৩২৫ পৃঃ।

শঙ্করদেবও শ্রীধরস্বামীর টীকা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন তাঁহার নিজ রচনা এবং মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(১৬) শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।১৪।১৫ ও ১৭—"নারায়ণপরা বেদা বেদা নারায়ণাঙ্গজা। ইত্যাদি শ্লোক।

শঙ্করদেবের সময় নবদ্বীপ নগরী শাস্ত্র চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তথায় পণ্ডিতমণ্ডলী বেদান্ত ও ন্যায়দর্শনের চর্চ্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন। মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের তদানীন্তন প্রধান গুরু শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যান। ইঁহারই শিক্ষায় বঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। ইনি ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনায় তৎকালে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। দক্ষিণ দ্রাবিড় হইতে শ্যামদাস, শ্রীহট্ট হইতে রাজা দিব্যসিংহ, দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীনাথ আচার্য্য, পুরী হইতে কর্ণাটরাজবংশীয় মুকুন্দদেব, পুরুষোত্তম ও কামদেব প্রভৃতি. বূঢ়ন হইতে হরিদাস এবং সপ্তগ্রাম হইতে যদুনন্দন আচার্য্য প্রভৃতি সমাগত হইয়া ইঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার সংস্পৃষ্ট প্রাচীন সাহিত্যে শঙ্কর নামক এক শিষ্যেরও উল্লেখ দেখা যায়।

এই শঙ্কর আসামের শঙ্করদেব কি না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। প্রাচীন সাহিত্যে একবার মাত্র ইঁহার নামোল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত মতবিরোধ হেতু শঙ্কর প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় প্রধান প্রধান ছাত্র শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া যান এবং ঐ সকল স্থানে স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করেন।

কি উপলক্ষে মতভেদ হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত এই। শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত যোগদান করিলে পরই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অলৌকিক প্রেমের দ্বারা অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার দলন করিয়াছিলেন। তিনিই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের জন্মদাতা। "শুষ্ক পত্রের ন্যায় শাস্ত্রচর্চ্চা নিষ্ফল" এই বলিয়া গৌরহরি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অহোরাত্র শুধু নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেন। হঠাৎ অদ্বৈত তাঁহার দল ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গিয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহোদয় তৎপ্রণীত "অমিয় নিমাইচরিত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই উপদেশ (জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব) শুনিয়া হরিদাস টলিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের কোন কোন প্রধান শিষ্যের মন টলিয়া গেল। যথা—শঙ্কর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈতের শঙ্কর নামক শিষ্য আসামে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন সেই দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না।"—(১ম খণ্ড,'অমিয় নিমাইচরিত,' ৫৩ পৃষ্ঠা) স্বর্গীয় জগদীশ্বর

গুপ্ত মহাশয়ও তৎসঙ্কলিত "চৈতন্যলীলামৃত" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত ঠিক এইরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি মাধব নামক অন্য শিষ্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য অশেষ বৈষ্ণবশাস্ত্রদর্শী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম। তিনিও শঙ্করদেব সম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত ঠিক অনুরূপভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অভিজ্ঞ বঙ্গীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা এই বৃত্তান্তে দৃঢ় বিশ্বাসবান্। মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের নামোল্লেখ প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে শঙ্করদেবের নামোল্লেখ নাই। তত্ত্বনিধি মহাশয় ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বে বিশ্বাসবান্ ছিলেন না, শ্রীচৈতন্য-সংস্পৃষ্ট প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহাদের বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈত-গোবিন্দবাদী ছিলেন অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতই গোবিন্দ, এরূপ বিশ্বাস করিতেন, শ্রীঅদ্বৈত-সংস্পৃষ্ট প্রাচীন পুঁথিতে তাঁহাদেরই বৃত্তান্ত অগ্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্ত বৈষ্ণব লেখকেরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের শতমুখে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের নিন্দাবাদ দ্বারা জিহ্বা কলুষিত করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা প্রায়শঃ একমত হইয়া শঙ্করদেব সম্বন্ধে এই কয়টী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন,—

১। শঙ্করদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

২। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই, গৌরহরি অবতাররূপে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বেই শান্তিপুর ত্যাগ করেন।

৩। তিনি অদ্বৈত-গোবিন্দবাদী ছিলেন না।

৪। তিনি জ্ঞানশূন্য ভক্তিমার্গের অনুরাগী ছিলেন না।

৫। তিনি শ্রীঅদ্বৈত বা অন্য কোনও বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তদ্দেশীয় কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই।

এই সকল সিদ্ধান্তের কোনটিই শঙ্করদেবের পরবর্ত্তী জীবনেতিহাসের বিরোধী নহে। আধুনিক অসমীয় লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের বহু পূর্ব্বে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাসের প্রধান

কারণ বোধ হয় এই যে, শঙ্করদেব বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অনেক বড়। কিন্তু ইতিহাস ও চরিতগ্রন্থগুলি এই কথার সমর্থন করে না। শঙ্করদেবের চরিতগ্রন্থগুলিতে দেখা যায়, তিনি বড়পেটায় (১৭) অধিষ্ঠান করিলে পরই তাঁহার প্রধান প্রধান ভক্ত-সমাগম হইয়াছিল। রাজা নরনারায়ণ ১৪৬২ শকে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার পরবর্ত্তী ২।৩ বৎসর মধ্যে শঙ্করদেব বড়পেটার অন্তর্গত পাটবাউসীতে (১৮) উপনিবিষ্ট হন এবং ঐ স্থানই কেন্দ্রভূমি করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। সুতরাং পাটবাউসীতে শঙ্করদেবের গমনের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৯১ বৎসর হইয়াছিল। তাহার ৭ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যের তিরোভাব হইয়াছে।

অদ্বৈত-সভায় ১৪৩০ শকে শঙ্করদেব উপস্থিত ছিলেন, এরূপ অনুমান হয় এবং ঐ সনেই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। "জোনাকী" পত্রে শঙ্করদেবের যে ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহার লেখক অনুমান করিয়াছিলেন যে, শঙ্করদেব ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রথম তীর্থযাত্রা করেন। শঙ্করদেবের জন্ম, দ্বাদশ বৎসরের পর বিদ্যারম্ভ, বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, পিতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগ, কন্যালাভ, কন্যার বিবাহ দান ইত্যাদি ঘটনার পর পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া তীর্থযাত্রা করেন; সুতরাং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ বৎসরের কম হইতেই পারে না। তিনি দ্বাদশ বৎসরান্তে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন; সুতরাং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসরের কম নহে। তাঁহার চরিতগ্রন্থগুলিতে জন্ম-শকের উল্লেখ নাই। ঐ শক ১৩৭১ বলিয়া এখন এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিলে ৫৬ বৎসরের স্থলে ৫৯ বৎসরের সময় অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের উপস্থিতি সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তাহা হইলে প্রথম তীর্থযাত্রার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৪ না হইয়া ৪৭ হয়।

অদ্বৈত-সভায় শঙ্করদেবের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহা শ্রীধরস্বামীর টীকা সহ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ব্যতীত অধিক নহে। তিনি শ্রীচৈতন্য বা শ্রীঅদ্বৈতের

---

(১৭) বর্ত্তমান কামরূপ জিলার মহকুমা। ইহার অন্তর্গত বড়পেটাসত্র মহাপুরুষ মাধবদেবের স্থাপিত, মহাপুরুষীয়দিগের বৃহত্তম সত্র। ইহা মহাপুরুষীয়দিগের শ্রীধাম। এখানকার কীর্ত্তন-ঘর দর্শনীয়।

(১৮) বর্ত্তমান বড়পেটা সহর হইতে ২৮৹ মাইল দূরে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত—শঙ্করদেবের পাটবাউসী ও দেব দামোদরের পাটবাউসী। শঙ্করদেবের জীবদ্দশায় পাটবাউসী ব্যতীত অন্যত্র কোনও সত্র স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের পর তৎপথাবলম্বী ধর্ম্মাচার্য্যগণ স্থানে স্থানে সত্র স্থাপন করিয়াছেন।

প্রদর্শিত পথের অনুবর্ত্তন করেন নাই। যদি করিতেন, তবে তাঁহার আত্মলোপ ব্যতীত উহা সম্ভবপর হইত না। বস্তুতঃ শঙ্করদেব অন্তনিরক্ষেপ থাকিয়াই নিজ প্রচার-ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য, অদ্বৈত ও শঙ্কর স্ব স্ব প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসের তারতম্য অনুসারে স্ব স্ব অধীত শাস্ত্রনিচয় যে ভিন্ন ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইঁহারা যে স্ব স্ব আলোক অনুযায়ী স্ব স্ব অনুসঙ্গীদিগকে বিভিন্ন পথে লইয়া গিয়াছিলেন, এ কথা ক্রমেই পরিস্ফুট হইবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ

দ্বাদশ বৎসরের পর শঙ্করদেব গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠকে গৃহাগত দেখিয়া বনগঞা গিরি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ও জামাতা হরির সহিত অগ্রগামী হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। খুল্লপিতামহগণ সত্বরপদে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তীর্থ-ভ্রমণ দ্বারা পবিত্রদেহ শঙ্কর তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহারা বারণ করিলেন :—

নমস্কার করিবাক কেহ নিদিলন্ত। সাধুবাদ করিয়া সাবটি ধরিলন্ত ॥

শঙ্কর, শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত প্রসাদ গৃহে গৃহে বিতরণ করিলেন। সেই প্রসাদ গ্রহণ ও শ্রীক্ষেত্রের মহিমা শ্রবণ করিয়া পিতামহগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শঙ্করের জ্ঞানালোকদীপ্ত ও পবিত্রতামণ্ডিত উন্নত দেহ পিতামহ-দিগেরও সম্ভ্রমের উদ্রেক করিল।

বনগঞা গিরি জামাতা হরির গৃহে ছিলেন। শঙ্করদেব ফিরিয়া আসিলে পর গৃহে আসিয়া শশব্যস্তে গৃহোপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তীর্থ-যাত্রাকালে শঙ্কর সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন—অনেকগুলি ধেনু খুল্লপিতামহ-দিগকে দিয়াছিলেন। বনগঞা গিরি স্বয়ং গোচারণের মাঠে গিয়া বাছিয়া বাছিয়া গাভী খেদাইয়া আনিতে লাগিলেন। রাখালেরা বাধা দিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া একটি রাখালকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিলেন। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য দয়ার্দ্র-হৃদয় শঙ্কর তাঁহাকে যথোচিত ভৎ'সনা করিলেন। পিতামহগণ এই সংবাদ পাইয়া শঙ্করের আবশ্যক বহু দ্রব্যাদি স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করিলেন। এতন্মাত্রেই তাঁহারা তুষ্ট হইলেন না। পুনরায় বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালনের জন্য তাঁহারা শঙ্করদেবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। শঙ্করদেব তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর যৌতুকস্বরূপ বহু ধন লাভ করিলেন।

পিতামহগণ তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহারা—

একশত তন্ত্রগিরি দিয়া তাঙ্ক অধিকারী—
শঙ্করক পাতিলা গোমস্তা।
কিন্তু— শঙ্করে জামাইক মাতি বুলিলা সাদরে আতি
তুমি চর্চ্চিবাহা তন্ত্রিগণ।
পড়িলাহা শাস্ত্র দুঃখে গৃহক বসিয়া সুখে
করিবোহো অর্থক বিচার॥—কণ্ঠভূষণ. ১৬ পৃঃ

শঙ্করদেবের খুল্লপিতামহ জয়ন্তের পুত্র শতানন্দ; তৎপুত্র জগদানন্দ (পরে রাম রায়) শঙ্করদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ও কাব্যামোদী। শঙ্করদেবের শাস্ত্রচর্চ্চার অভিলাষ শুনিয়া জগদানন্দ কহিলেন, "দাদা, যদি তুমি অনুমতি কর, আমার বাড়ীতে একটি দেবগৃহ (১৯) নির্ম্মাণ করি; তথায় নির্জ্জনে শাস্ত্রালোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।" শঙ্করদেব সানন্দে সম্মত হইলেন। রামরাম গুরুও ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। দেবগৃহ নির্ম্মিত হইলে পর তথায় প্রাত্যহিক শ্রীমদ্ভাগবতচর্চ্চা ও কৃষ্ণ-কথালাপ আরম্ভ হইল।

তৎকালে আসামে ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, কবি রাম রায় (২০) তৎপ্রণীত "গুরুলীলা" গ্রন্থে তাহা এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন:—

কামাখ্যা দেবীর রাজ্য কামরূপ নাম। চারি জাতি যথেষ্ট প্রবর্ত্তে অনুপাম॥
রজক নাপিত ধোবা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। ইত্যাদি জাতির কিছু নাহি চল ছিদ্র॥
আনদেশে নিজ বৃত্তি মাত্র আচরয়। বালক জন্মিলে দাহ্ নাড়িক ছেদয়॥
শিবদুর্গা গ্রামদেব পূজয় সতত। হরিভক্তি করন্তা নাহিক ই রাজ্যত॥

দৈত্যারি ঠাকুরও আসামের তদানীন্তন অবস্থাবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—

ই দেশত পূর্ব্বকালে নাছিল ভকতি। নানা ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক করিল সম্প্রতি॥
নানা দেব পূজয় করয় বলিদান। হাঁস ছাগ পার * কাটে অসংখ্য প্রমাণ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান তীর্থস্নান করে। স্বর্গ নরকত আয়াযাত করি মরে॥

(১৯) ইহাই আসামে 'নাম ঘরের' সূচনা বলিয়া বোধ হয়।

(২০) ইনি শঙ্করদেবের ভ্রাতা রাম রায় নহেন। ইনি ব্রাহ্মণ ও দেব দামোদরের শিষ্য। তাঁহার রচিত 'গুরুলীলা' গ্রন্থ দেব দামোদরেরই চরিত-গ্রন্থ।

* পার—পারাবত, কবুতর।

গীতা ও ভাগবতচর্চ্চা করিতে করিতে শঙ্করদেব ভাবিতে লাগিলেন :—

দৈবকীনন্দন এক বেদমাত্র শাস্ত্র এক
দৈবকীনন্দনে কৈলা থাক।
কর্ম্ম এক তান সেবা মন্ত্র এক তান নাম
জানিবা নিশ্চয় করি আক ॥
ইয়াক না জানি নরে ঘোর সংসারত মরে
নানা দুঃখ কর্ম্মক আচরি।
কৃষ্ণগুণ নাম ধর্ম্ম লোকত প্রচার করো
সুখে যাউক সংসার নিস্তরি ॥

শুভক্ষণে শ্রীমন্ত শঙ্কর এই সাধু সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং কৃষ্ণকথা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

কথিত আছে, ত্রিহুতদেশীয় জগদীশ মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে শঙ্করদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শুনাইতে আগমন করেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, শ্রীমন্ত শঙ্কর শুধু শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন নহে, উহার মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়া পদ পর্য্যন্ত রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ভাষায় রচিত পদগুলি আবার এরূপ সহজবোধ্য ও বিশুদ্ধ হইয়াছে যে, ঐগুলি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

টেম্বুয়ানিবন্ধের হোঙ্করা কুঞ্জিয়া গিরির পুত্র গয়াপাণি তীর্থযাত্রীদের সমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তিনি আঢ্য লোকের সন্তান; সুতরাং তাঁহার সঙ্গীরা জগন্নাথ দর্শনের পর অন্যান্য তীর্থে যাইতে সোৎসাহে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তীর্থ ভ্রমণে তাঁহারও অনিচ্ছা ছিল না। কথিত আছে, আর তীর্থভ্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে ইনি জগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন। গয়াপাণি এইরূপ স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু আদেশ পালন করিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একদা শঙ্করদেব যে গৃহে বসিয়া রামরাম গুরু ও জগদানন্দের সহিত কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শঙ্করদেবের সহিত কথাপ্রসঙ্গে এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন :—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ ॥

গয়াপাণি শ্লোক পাঠ করিলেন বটে, কিন্তু অর্থ করিতে পারিলেন না। তখন শঙ্করদেব এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন :—

কৃষ্ণর উদার কথার প্রসঙ্গ যথাত হোয়ে নিশ্চয়।
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ নিবাস তথা করয়॥

শ্লোকার্থ শুনিয়া জগন্নাথের স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম গয়াপাণির হৃদগত হইল; কারণ, তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বদেশেই শঙ্করগৃহে উদার অচ্যুত-কথা-প্রসঙ্গ হইতেছে, সুতরাং আর তাঁহার অন্য তীর্থ ভ্রমণে প্রয়োজন কি? তিনি বিস্ময়ে পুলকিত হইয়া শঙ্করদেবের শরণ লইলেন। ইনিই শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত রামদাস।

ক্রমে শঙ্কর-মাধবের সম্মিলন হইল। মহাপুরুষ মাধবদেবের পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই। বাণ্ডুকা (২১) নিবাসী গোবিন্দগিরি 'ভূঞা' পদে নিযুক্ত হইয়া টেম্বুয়ানিবন্ধে আগমন করেন এবং দারান্তর গ্রহণ করিয়া রামরাই কেতাই খাঁ প্রভৃতি জ্ঞাতি সহকারে তথায় উপনিবিষ্ট হন। আহমদিগের দৌরাত্ম্যে তিনি টেম্বুয়ানিবন্ধ হইতে পত্নীসহকারে পলায়ন করেন। পথে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হরশিঙ্গা বড়ার আশ্রয়ে কিছু কাল যাপন করেন। তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ইনিই মাধব। পশ্চাৎ এক কন্যা হয়। কন্যা বয়ঃস্থা হইলে তিনি টেম্বুয়ানিবন্ধে গিয়া পূর্ব্বোক্ত গয়াপাণিকে কন্যাদান করেন এবং পত্নীকে জামাতৃগৃহে রাখিয়া মাধবকে লইয়া পূর্ব্বভবন বাণ্ডুকাতে চলিয়া যান। এত দিন পর্য্যন্ত সুযোগ অভাবে মাধবের বিদ্যাশিক্ষা কিছুই হয় নাই।

কতোদিন মানে আছি সেহি থানে বুঢ়া আতা (২২) আনন্দত।
মাধবদেবক পঢ়াইলা সমস্ত কায়স্থিকা বৃত্তি যত॥
আনো শাস্ত্র যত পঢ়াইলা সমস্ত গদ্য পদ্য সংস্কৃত।
ন্যায় তর্ক নীতি শিখাইলা সম্প্রতি আনো যত কর্ম্ম নিত্য॥

(২১) বাণ্ডুকা কোথায়, নিশ্চয় করা সুকঠিন। ভারতীর ৩২ খণ্ড নবম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন, "মাধবের ভাগিনেয় রামচরণের বংশধর বামুনার বর্ত্তমান অধিকারীবংশীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি যে, এই বাণ্ডুকা বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোনও গ্রাম। সম্প্রতি কীর্ত্তিনাশা পদ্মা ইহাকে গ্রাস করিয়াছে।" শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজরড়ুয়া মহাশয় তৎপ্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বাণ্ডুকা ধরলা নৈর (যাক আজি কালি ধলা বোলে) তীরত আছিল।"

(২২) বুঢ়াআতা অর্থাৎ গোবিন্দগিরি। ইনি আসামে দীঘল পুরিয়া গিরি নামেই পরিচিত হন। এতদ্ভিন্ন 'কাণলমা' বা 'লামকাণা' নামেও অভিহিত হইতেন। "কাণ লম্বা দেখি আসামে দিলেক তান কাণলমা নাম।"—দৈত্যারি ঠাকুর।

গোবিন্দ তান্ত্রিক-অনুষ্ঠান-পরায়ণ ঘোর শাক্ত ছিলেন। সুতরাং মাধবও সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষাই লাভ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাধব বাণ্ডুকা ত্যাগ করিয়া টেম্বুয়ানিবন্ধে মাতার নিকট ফিরিয়া আসেন ও ভগ্নীপতি গয়াপাণির গৃহে মাতা ও ভগ্নীর সহিত বাস করেন। আহমদিগের দৌরাত্ম্যে টেম্বুয়ানিবন্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তথাকার লোকেরা ধুঞাহাটা বা বেলগুড়ি (২৩) অঞ্চলে চলিয়া যান। মাধব পিতৃসম্পত্তি লাভের আশায় ধুঞাহাটা হইতে পুনরায় বাণ্ডুকাতে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শঙ্করদেবের সাক্ষাৎকার পাইয়া গয়াপাণি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বাণ্ডুকা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে জননীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাধব মাতার আরোগ্য কামনায় 'জোড়া পাঠা বলি' মানস করেন। গৃহে আসিয়া মাধব দেখিলেন, জননী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। দেবীপূজার সময় সন্নিহিত হইলে তিনি 'জোড়া পাঁঠা বলির' উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য কিছু তাম্বূল বিক্রয় করা আবশ্যক হইল। তাম্বূল লইয়া হাটে যাইবার সময় মাধব ভগ্নীপতিকে দুইটি শ্বেত ছাগ কিনিয়া আনিতে বলিয়া গেলেন। গয়াপাণি তখন রামদাস হইয়াছেন। মাধব তাহা জানিতেন না। হাট হইতে আসিয়া মাধব জিজ্ঞাসিলেন, 'পাঠা কই?' গয়াপাণি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'গৃহস্থের ঘরে অনেক পাঁঠা আছে।' মাধব প্রত্যহই পাঠার কথা জিজ্ঞাসা করেন, আর গয়াপাণি 'আনিব' 'আনিব' মুখে বলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করেন না। ক্রমে পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আর বিলম্ব করা চলে না। মাধব গয়াপাণিকে কহিলেন, 'চল, পাঠা নিয়া আসি।'

গয়াপাণি। পাঁঠা কি করিবে?

মাধব। অ্যাঁ! তুমি জান না, দেবীকে জোড়া পাঁঠা মানস করিয়াছি?

গয়াপাণি। তা ত শুনিয়াছি। কিন্তু পাঁঠা কাটিলে কি হয় জান?

মাধব। কি হয়?

গয়াপাণি। যে পাঁঠা বলি দেয়, সে পরজন্মে পাঁঠা হয়, আর পাঁঠা মানুষ হইয়া তাহাকে—

মাধব। (সক্রোধে) আচ্ছা, বলি দেয় দিবে। তুমি পাঁঠা আনিবে কি না, বল?

গয়াপাণি। ভাল, আমার কথাটাই একবার বুঝিয়া দেখ না কেন।

---

(২৩) এই স্থান টেম্বুয়ানিবন্ধের উত্তরে।

মাধব। তোমার ও সব কথা আমি শুনি না। কে তোমাকে এ সব কথা বলিয়াছে?

গয়াপাণি। যেই বলুক না কেন, এ সব শাস্ত্রের কথা।

মাধব। শাস্ত্র! তুমি আমাকে শাস্ত্র শিখাইতে চাও?

গয়াপাণি। তা কি পারি! তবে ইচ্ছা হয়, চল, যে শাস্ত্রে এ কথা আছে, সেটা একবার দেখিয়া আসিবে।

মাধব ও গয়াপাণি ভোজনে বসিয়াছিলেন। এ সব কথা শুনিয়া ক্রোধে মাধবের আর আহার হইল না। উভয়েই তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আবার তর্ক আরম্ভ হইল। গয়াপাণির কথা শুনিতে শুনিতে কোন্ শাস্ত্রে এ সব কথা আছে জানিতে মাধবেরও কৌতূহল জন্মিল। তিনি গয়াপাণির সঙ্গে শঙ্কর-সন্নিধানে চলিলেন।

মাধব ও শঙ্করদেবের ঘোর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হইল। আসামে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এই প্রথম। মাধবের শাস্ত্রচর্চ্চাও অল্প ছিল না। উভয়েই স্ব স্ব মতপোষক বহু তন্ত্র ও পুরাণে অভিজ্ঞ ছিলেন। সেই সকল গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া একে অপরের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন।

দুই হন্তো তোলন্ত শাস্ত্র দুই হন্তো খণ্ডন্ত। দুয়ো কথা কন্ত দুয়ো দুয়োক ন মানন্ত॥
মাধবে শাস্ত্রক দেখাই প্রবৃত্তি কহন্ত। নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্করে খণ্ডন্ত॥
প্রভাতরে পরা তিনি পর বেলি গৈল। দুই হন্তরো কথা সাঙ্গ তথাপি ন ভৈল॥

এই দ্বৈরথ-যুদ্ধে শঙ্করদেবই বিজয়ী হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, মাধবও তত্তুল্য শাস্ত্রদর্শী। সমস্ত পুরাণের উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া শঙ্কর কহিলেন,—

সকলে পুরাণ যেন প্রকাশ চন্দ্রর॥ ....
কোটি সূর্য্যসম প্রকাশয় ভাগবত। কাব্য পুরাণর কিছু নাহিকে মহত্ত্ব॥
ভারতপুরাণ ব্যাস ঋষি করিলন্ত। যার যেন জাতি-ধর্ম্ম সবে বিহিলন্ত॥
চারিয়ো বেদের করিলন্ত শাখাভেদ। তথাপিতো নুগুচে মনর তান খেদ॥
পশুহিংসা ধর্ম্ম বিহিলন্ত জগতত। সি কারণে সুস্থ নাই ব্যাসর মনত॥
বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র ইতো মহাভাগবত। নারায়ণে কহিলন্ত ব্রহ্মার আগত॥
ব্রহ্মা নারদত কৈলা নারদে ব্যাসত। ব্যাসে করিলন্ত পাছে মহাভাগবত॥

কথিত আছে, মাধবদেব শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিলে পর শঙ্করদেব এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথাচ সর্ব্বার্চ্চনমচ্যুতেভ্যঃ॥

অর্থাৎ—

বৃক্ষমূলে জল দিলে ডালে পত্রে পুষ্পে ফলে সমস্তরে তৃপিতি হোয়য়।
প্রাণের ভোজনে যেন ইন্দ্রিয় তৃপিতি হোয়ে কৃষ্ণের পূজনে দেবগণ॥

মাধব কুতার্কিক ছিলেন না। তাই পরাজিত হইয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভগ্নীপতিকে কহিলেন, "তুমি শঙ্করদেবের নিকট আজ আমায় আনিয়া বড় উপকার করিলে। আমার বোধ হইতেছে, তোমার কৃপায় যিনি জ্ঞান-রশ্মিতে অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলন করেন, আমি সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ পাইলাম।"

মাধবের দেবীপূজা আর হইল না। অষ্টমী তিথি সমাগত দেখিয়া তিনি ধূপ, দীপ ও তাম্বূলসহকারে নৈবেদ্য রচনা করিলেন এবং রামরাম গুরুর সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, "গুরো! এই নৈবেদ্য তুমি শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দাও।" রামরাম গুরু সহাস্যে মাধবের গৃহে আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন। সেই উৎসৃষ্ট নৈবেদ্য লইয়া মাধব শঙ্করদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর-দেব কহিলেন, "কি হে মাধব! কাল তোমার দেবীপূজা হইবে, আজ যে নৈবেদ্য লইয়া আসিলে!" মাধব দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এ দেবীর প্রসাদ নহে। এই নৈবেদ্য রামরাম গুরু শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।" একথা শুনিয়া শঙ্করদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র রামানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস! এই প্রসাদ তুলিয়া রাখ। আমি স্বয়ং ইহা ভক্ষণ করিব।" এইরূপে মাধব-বিজয় সম্পন্ন হইল।

তখন শঙ্করদেব রামরামগুরু প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মাধবের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তোমরাও সকলে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও।" এখন হইতে প্রকাশ্যে দীক্ষা আরম্ভ হইল। মাধব, রামদাস, শঙ্করের জামাতা হরি প্রভৃতি একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন। শঙ্করদেব মাধবকে এই উপদেশ করিলেন,—

শঙ্করে বোলন্ত মাধবের মুখ চাই। ভকতির সাধন সৎসঙ্গ বিনে নাই॥
ভগবতি নিগুর্ণার পৃথক্ সাধন। সৎসঙ্গ ভক্তির কথা শুনা দিয়া মন॥
প্রথমতে মহন্তর সুশ্রূষা করিবেক। শুদ্ধভাব দেখি তান কৃপা মিলিবেক॥
কহিবন্ত ধর্ম্ম ধরিবন্ত শুদ্ধমতি। হরিকথা প্রসঙ্গত উপজিব রতি॥

কৃষ্ণ হৈবেক প্রেম দৃঢ়ভক্তি জাত। দেহ ব্যতিরেকে আত্মা জানিবা সাক্ষাত॥
কৃষ্ণর পরম কৃপা হৈবে তাক প্রতি। সর্ব্বজ্ঞতা আদি গুণ মিলিবে সম্প্রতি॥

মাধব-বিজয়ের কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইল। শাক্তসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ মিশ্র বামনাচার্য্য, রত্নাকর কন্দলি প্রভৃতি অগ্রণী ব্যক্তিরা অন্যান্য সামাজিকদিগকে আহ্বান করিয়া সভা পাতিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখে একই কথা, 'শঙ্কর গোমস্তা নাকি ভক্তির পথ প্রকাশ করিতেছে? যদি সকলেই এক শরণিয়া হইয়া পড়ে, দেবীপূজাদি ক্রিয়াকাণ্ড না করে, তবে ধর্ম্ম রহিল কোথায়?' শ্রীধর ভট্টাচার্য্যের কিছু তর্ক-শাস্ত্রে অধিকার ছিল। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, শঙ্করের উদ্ভাবিত সমস্ত মতে দোষারোপ করিয়া তাহা খণ্ডন করিব; নিশ্চয় বলিতেছি, তোমরা তাহা দেখিতে পাইবে।" শঙ্করদেবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "শঙ্কর সামান্য লোক, উহার সহিত আবার বিচার কি? একাকী বসিয়া যাহা ইচ্ছা করুক, তোমরা কেহ উহার কথায় কাণ দিও না। তাহা হইলে লজ্জা পাইয়া সে আপনা আপনি নিরস্ত হইবে।" কবিরাজ মিশ্র বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি শঙ্করদেবের ভগবদ্ভক্তিরও কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "না হে না, শঙ্করকে এরূপ তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। শঙ্কর পরমপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্রাহ্মণ হইতেও ভগবদ্ভক্ত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।" তখন রত্নাকর কন্দলি কহিলেন,—"ভাল ভাল! যদি শঙ্করকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারা নাই যায়, আমি বলি, এক কাজ কর। 'ভকত'দিগকে দেখিলেই নিন্দা করিতে আরম্ভ কর। বিস্তর নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে 'ভকতের দল' তাহাদের মত অবশ্যই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।" এই কথায় অনেকেই "সাধু! সাধু!" বলিয়া সম্মতিসূচক উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 'ইহাতেও যদি 'ভকতদিগের' দমন না হয়, তখন অন্য উপায় উদ্ভাবিত হইবে।' সভা ভঙ্গ হইল, সকলেই ঘরে ঘরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কাহারও মনে শান্তি রহিল না।

মাধবদেব দেবীপূজা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলে পর ক্রমেই একটি দুইটি করিয়া লোক শঙ্করোপদেশে শ্রীকৃষ্ণপদে শরণ লইতে আরম্ভ করিল। 'ভকত-দিগের' সংখ্যা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বৈষ্ণবাচারের ঘটা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ দিকে শাক্তেরাও তাঁহাদের সংকল্পিত উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

মালা-হস্তে ভক্তেরা কৃষ্ণনাম করিতে করিতে পথে বাহির হইলেই অনেকেদলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে-লাগিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন, "অরে! ভকতিয়া, এ দিকে আসিস্ না—আসিস্ না! আমাদিগের এই-টুকু পথ অপবিত্র করিস্ না!" কেহ বা জপের মালা কাড়িয়া লইয়া কুকুরের লেজে বাঁধিয়া দিলেন! ভক্তেরা স্বল্পসংখ্যক, নীরবে এই সকল উপদ্রব সহিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সকল কথা শঙ্করদেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, পর দিবস বুড়া খাঁর গৃহে প্রকাশ্য সভায় বিরুদ্ধ-বাদীদের দমন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবেন। এইরূপে নির্জ্জন গৃহকোণ হইতে বহির্গত হইয়া শঙ্করদেব প্রচার-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

মাধবদেবের পিতা দীঘল পুরিয়া গিরির সহিত কেতাই খাঁ নামক তাঁহার যে জ্ঞাতি আসামে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, উপরোক্ত বুড়া খাঁ তাঁহারই পিতা। কেতাই খাঁ সম্পর্কে শঙ্করদেবের পিসা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইনিই তৎকালে গাঙ্গ মৌ (২৪) অঞ্চলের 'ভুক্রা' পদে আসীন ছিলেন। ইঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমস্ত সমাজের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়াই শঙ্করদেব সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবেন বলিয়া কল্য প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত ভক্তগণ মালা হাতে সভায় যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন শঙ্করদেব ভাবিতেছেন,— "কল্য ক্রোধবশে যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ভাল হয় নাই। এই ভারতভূমিতে বেদবিধি ও ধর্ম্ম ব্রাহ্মণই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক অব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু ইঁহাদিগকে এই প্রকার প্রকাশ্যে অপমান করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণকুলের অবমাননা হইবে। ভাল, আমি ব্রাহ্মণদিগের মুখেই হরিনাম ব্যক্ত করিব।" মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া তিনি রামরাম গুরু, মাধব ও রামদাস ইত্যাদি ভক্তগণ সহ বুড়া খাঁর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে রত্নাকর কন্দলী কিছু লঘুহৃদয় ছিলেন। ইনিই পূর্ব্বে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, নিন্দাবাদ দ্বারা ভক্তদিগকে নিরস্ত করিতে হইবে। শঙ্করদেব সভাস্থ হইয়া ইঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং সবিনয়ে কহিলেন,—"গুরো! আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বিবেচনা করিয়া আমাকে একটা ব্যবস্থা দিন।" শঙ্করের বিনয়পূর্ণ জিজ্ঞাসায় কন্দলী মনে মনে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার

---

(২৪) গাঙ্গ মৌ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে আধুনিক দরঙ্গ জিলার অন্তর্বর্ত্তী।

প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে কিছু অভিমানও জন্মিল। কারণ, তিনি ভাবিলেন, উপস্থিত পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াই শঙ্করদেব তাঁহার ব্যবস্থাপ্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি শঙ্করদেবের প্রিয়বাক্য কথনের জন্য স্বয়ং প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাপী লোকের শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার আছে, না নাই?"

কন্দলী কহিলেন, "পাতকীর কোনও কর্ম্মে অধিকার নাই।" শঙ্করদেব জিজ্ঞাসার ভাবে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলেই সম্মতি-সূচক মস্তকান্দোলন করিলেন।

শঙ্কর। পাতকীর হরিনাম গ্রহণে অধিকার আছে, না নাই?

কন্দলী। হরিনাম গ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে।

শঙ্করদেব আবার ব্রাহ্মণমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আবার মস্তকান্দোলনে সকলে সম্মতি দিলেন।

শঙ্কর। পাতকী ব্যক্তির প্রদত্ত ভোজ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে কি?

কন্দলী। পাপীর বস্তু গ্রহণে পাপ হয়। এবারও মাথা নড়িল।

তখন শঙ্করদেব বুঢ়া খাঁকে ডাকিলেন। বৃদ্ধ বুঢ়া খাঁ 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ধর্ম্ম আচরণ করিতেছিলেন। তিনি আসিয়া কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান হইলে শঙ্করদেব কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণ প্রভুরা বলিতেছেন, পাপীর কোন কর্ম্মে অধিকার নাই এবং পাপীর প্রদত্ত অন্ন গ্রহণীয় নহে। আপনি এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক অকপটে বলুন, আপনি পাপী, না পুণ্যাত্মা।"

বৃদ্ধ বুঢ়া খাঁ, "বাবা, আমি আবার পুণ্যাত্মা। আমি ঘোর পাপী।" এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন শঙ্করদেব দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "প্রভুগণ! এই ব্যক্তি স্বয়ং বলিতেছেন, ইনি পাপী; সুতরাং ইঁহার পিতৃলোকের কর্ম্মে অধিকারই নাই। আর আপনারা ইঁহার অন্ন ভোজন করিয়াছেন। সুতরাং আপনাদেরও পাপস্পর্শ হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, এক হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত আপনাদের আর কোনও কর্ম্মে অধিকার নাই। অতএব একবার হরিধ্বনি করুন।" এই বলিয়া শঙ্করদেব হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। অমনি সমস্ত ভক্তগণ হরিবোল হরিবোল বলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। হরিনামের উচ্চ ধ্বনিতে শ্রাদ্ধবাসর কম্পিত হইল—আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আসামে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

শঙ্করদেবের দৃঢ় কৃষ্ণভক্তিতে কি প্রকারে আসামে বৈষ্ণবাচার প্রবর্ত্তিত ও হরিনামের উচ্চ ধ্বনি সমুত্থিত হইল, পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকমাত্রেই এই সংসারে অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা যৎপরোনাস্তি নিগৃহীত হইয়াছেন ; অধিক কি, অনেককেই বিপক্ষের প্রবল জিঘাংসার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। কিন্তু ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই সকল দৃঢ় বিশ্বাসীরা কিছুতেই স্বমত ত্যাগ করেন নাই। পরন্তু সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ আপদের মধ্যেও স্থানুবৎ অটল ও অবিচলিত থাকিয়া স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের জীবনেও এই মহাজনসুলভ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

বুঢ়াখাঁর গৃহে প্রকাশ্য সভায় অপদস্থ হইয়া শঙ্করদেবের প্রতিপক্ষেরা বুঝিলেন সামান্য লোকের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। চির-প্রচলিত ধর্ম্মের সংরক্ষণ জন্য এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর আশু দমন অত্যাবশ্যক মনে করিয়া শাক্ত সমাজের অগ্রণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অহমরাজ চুহুমুঙ বা স্বর্ণনারায়ণের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে শঙ্করদেব অনাচার শিক্ষা দিয়া রাজ্য নষ্ট করিতেছেন। অহমরাজগণ তখন হিন্দু আচার গ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে স্বর্ণনারায়ণ শঙ্করদেবকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। শঙ্কর ধৃত ও বিচারার্থ রাজ সকাশে আনীত হইলে পর প্রতিপক্ষেরা তাঁহাদের অভিযোগ ব্যক্ত করিতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলিলেন "শঙ্কর শ্রাদ্ধ কর্ম্ম বারণ করিতেছেন!" রাজা—শ্রাদ্ধ কি স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর-দেবকে মুক্তিদান করিলেন।

উত্তরোত্তর পরাজয়ের পর শাক্তগণ ভক্তি ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে শঙ্করদেব রামু রায়কে ডাকিয়া এক জগন্নাথ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে কহিলেন এবং প্রচার করিলেন, এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বহু অর্থ দান করিবেন। অর্থলোভে অনেক ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে উপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্করদেব ব্রাহ্মণদিগকে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই কি ঈশ্বর?" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "ইনি ঈশ্বর বই কি? ইনি

সাধু মহান্তের স্থাপিত।” শঙ্করদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাধু কাহাকে বলেন ?” এবার ব্রাহ্মণের স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন,—

জানা যিতো জনে হরি ভকতি করয়।
তা সম্বাকে সাধু বুলি বিপ্র সবে কয়॥

“তবে আর হরিভক্তদের বিদ্বেষ করেন কেন ?” শঙ্করদেবের এই কথায় উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা প্রকৃতই লজ্জাবোধ করিলেন। তখন শঙ্করদেব—

উচ্চ করি সমজ্যাত হরি বোলাইলন্ত।
সভা বিসর্জ্জিয়া পাছে গৃহক গৈলন্ত॥

সেই দিন ব্রাহ্মণেরা হরিনাম লইলেন বটে, কিন্তু তাহা মৌখিক। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে সঞ্চারিত হয়, শঙ্করদেব তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। গীতা ও ভাগবতাদির চর্চা করিলে দৃঢ় কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হইতে পারে, এই ভাবিয়া শঙ্করদেব এক দিবস ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, “শুভ মাঘ মাস উপস্থিত, আপনি পরম পণ্ডিত ; আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনার মুখে গীতা শ্রবণ করি।” ব্রহ্মানন্দ গীতা পাঠ করিতে সম্মত হইলেন। তখন শঙ্করদেব উপস্থিত ভক্তদিগকে কহিলেন, “ইনি গীতাশাস্ত্র পাঠ করিবেন. ইঁহাকে কিছু অর্থ দান করা উচিত।” তখন ভক্তগণ সকলেই কিছু কিছু অর্থ দান করিলেন। অনেক অর্থ সঞ্চিত হইল।

দক্ষিণ হস্তক পাতিলন্ত ব্রহ্মানন্দে।
দিবাক লাগিল বিত্ত মনত আনন্দে॥
কতো এক তোল্লা কতো তিনি মহাবিত্ত।
অর্দ্ধ তোলা তুচ্ছ হুহি দেন্ত রঙ্গ চিত্ত॥
তেখেনে পাইলেক বিপ্রে বিত্ত এক পোষ।
বিত্ত পাই চিত্ত করে উল্লস মাল্লস॥

ব্রহ্মানন্দ যথাসময়ে গীতা পাঠ করিলেন। অনেক দক্ষিণাও পাইলেন। শঙ্করদেব তখন কহিলেন “গুরো ! এই যে কৃষ্ণকথা পাঠ করিলে, সেই কৃষ্ণপদে তোমার শরণ লওয়া উচিত।” ব্রহ্মনন্দ এবং ক্রমে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা গীতা ও

ভাগবতচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এইরূপে শঙ্করদেব মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া অনেক উগ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে বশীভূত করিলেন।

শাক্তদিগের প্রতিকূলাচরণ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর যথারীতি কীর্ত্তন ও নাম-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। ভক্তদিগেব সংখ্যাবৃদ্ধি ও ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রথম ভক্তিশাস্ত্র সমূহের ভাষাগ্রন্থ রচনা ও প্রচার করিয়া শঙ্কর-দেব ভক্তিতত্ত্ব সকল জনসাধারণের বোধসুলভ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্তে তিনি স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা অনেক গ্রন্থের ভাঙ্গনি প্রকাশ করিলেন। নিম্নলিখিত মুদ্রিত অসমীয়া গ্রন্থে শঙ্করদেবের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়—

১। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ অনাদি পাতন।
২। ঐ অষ্টম স্কন্ধ অমৃত মথন ও দেবাসুর-যুদ্ধ।
৩। ঐ ঐ বলি-ছলন স্কন্ধ।
৪। ঐ দশম ও একাদশ স্কন্ধ।
৫। বড় গীত ভটিমা ও গুণমালা।
৬। বৈষ্ণবী-কীর্ত্তন বা নাম-কীর্ত্তন।
৭। বৈষ্ণব-কীর্ত্তন।
৮। কীর্ত্তন।
৯। রামায়ণর উত্তরাকাণ্ড।
১০। লীলামালা।
১১। রুক্মিণীহরণ।
১২। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
১৩। সীতা-সয়ম্বর প্রভৃতি কয়েক খানি নাটক।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ দশম ও একাদশ স্কন্ধ অতি বৃহৎ। ঐ গুলির রচনায় বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ শঙ্করদেব অতি বাল্যকাল হইতে শেষ বয়সপর্য্যন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান (২৫) তাঁহার শৈশব-রচনা। এই পুঁথির বন্দনাটি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তখনও কৃষ্ণ-নামে তাঁহার দৃঢ়তা জন্মে নাই। হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে বিশ্বমিত্র ঋষিকে সমগ্র রাজ্যদান ও আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষিণা সংগ্রহ এই সকল কার্য্যই এই উপাখ্যানে প্রকৃতিপুঞ্জসহ হরিশ্চন্দ্রের সশরীরে স্বর্গারোহণের হেতুভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু :—

তন্ত্র মন্ত্র যজ্ঞ যত তপ তীর্থ কোটি শত
হরিনাম অধিক সবাতে। (কীর্ত্তন ৪৭৬ পৃঃ)।

ইহাই উত্তরকালে শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তগণ কর্তৃক উদ্‌গীত হইয়াছিল। এক হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান ব্যতীত শঙ্করদেব আর যাহা কিছু লিখিয়াছেন তৎসমস্তই ভক্তিশাস্ত্রমূলক। শেষবয়সে রাজা নরনারায়ণের অনুরোধে তিনি সমগ্র কৃষ্ণলীলা একটি কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া "কৃষ্ণগুণমালা" রচনা করেন।

ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারে শঙ্করদেবের আজীবনব্যাপী প্রয়াস বহু ফলোপধায়িনী হইয়াছিল। একেত তাঁহার কবিত্বশক্তি অতুলনীয় তদুপরি বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ভক্তিতত্ত্বের প্রচারে ঐকান্তিকতা হেতু তাঁহার রচনা সর্ব্বত্র মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। পৌরাণিক বৃত্তান্তসকল বর্ণনায় তিনি শুধু মূলের অনুবাদ করিয়াছেন এমন নহে; প্রায়শঃ বিভিন্ন পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তমালা একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ঐ গুলি লোকের অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাঁহার রচনায় যে যে স্থলে মূল শ্লোকের অনুবাদ দেখা যায়, ঐ গুলি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতররূপে কেহই পদ্যে অনুবাদ করিতে পারিবেন কি না সংশয়স্থল। তাঁহার রচনার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ঐ গুলিতে স্বকপোল কল্পিত কথার সংমিশ্রণ অধিক নহে। ইহার ফলে তাঁহার রচনা তর্কস্থলে প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ৮ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে "চৈতন্য-চরিতামৃত" রচনা

(২৫) 'হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের' প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে ৬০০ শতেরও অধিক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংশোধিত মুদ্রিত গ্রন্থে ৫১২টি পদ আছে। ৬০৪ সংখ্যক পদটী এই :— 'চয়ালের বাণি হেন মনে জানি, মনে হৈবা পরিতোষ।" ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রদীপ' দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে ঐ গ্রন্থ প্রচার করিতে দেন নাই। তিনি এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের সার ঐ গ্রন্থে ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে। উহা পাঠ করিয়া লোকে অনায়াসে ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। তৎপরে মূলশাস্ত্র পাঠে কাহারও আগ্রহ থাকিবে না। শঙ্করদেবকর্তৃক ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে কেহই এইরূপ বাধা দিতে পারেন নাই। ফলে আসামের বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে শঙ্কর-মাধব রচিত কীর্ত্তন, দশম নাম-ঘোষা প্রভৃতিই শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ গুলি যে সকল মূল সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার চর্চ্চা এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। জীব গোস্বামীর নির্দ্ধারিত প্রণালীর উপকারিতা থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানবোধ-সুলভ ও অনায়াসলভ্য হইলে তাহারও যে কিছু শুভফল না আছে এমন নহে। শঙ্কর-মাধব রচিত ভক্তিশাস্ত্রগুলি আপামর-সাধারণের মধ্যে যেরূপ বহুল প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ পুঁথিগুলির অসংখ্য পদ লোকের মুখে মুখে সতত উচ্চারিত হইতেছে। ঐ গুলির অর্থবোধের জন্য জটিল ও দার্শনিক টীকা নিষ্প্রয়োজন। আবৃত্তিমাত্র ঐ গুলি বোধগম্য হইয়া থাকে। অধুনা সংস্কৃতশাস্ত্রাদি মুদ্রিত ও অনুবাদসহকারে প্রচারিত হওয়ায় তর্কস্থলে শঙ্কর-মাধবের উক্তির মূল নির্দ্দেশেও অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

শঙ্করদেবকর্তৃক ভক্তিশাস্ত্রের প্রকাশহেতু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব লোকসমাজে প্রচারিত লাগিল। তদুপরি রাম রাম গুরু, মাধব, রামদাস প্রভৃতি মহা মহা ভক্তদের সহিত নাম-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। শঙ্কর ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—লোকে সাগ্রহে শুনিতে লাগিল—কীর্ত্তন ও ভাওনার আনন্দে সকলে মাতিয়া উঠিতে লাগিল—দ্রুতবেগে দেশে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শঙ্করদেব বড়পেটা অঞ্চলে অধিষ্ঠান করিলে পরই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। উপর আসামেও তিনি বহুকাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপর-আসামে তিনি নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহাকে নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির সহিত দৃঢ়তা সহকারে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

বরদোয়ার "আতা আরুভক্ত-সংবাদ" নামক এক স্থানে পুঁথিতে শঙ্করদেব কোন্ স্থানে কত কাল বাস করেন, তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :—

স্থান	কাল	স্থান	কাল
আলিপুখুরি	১৩ বৎসর।	বেলগুরি বা ধুঞাহাটা	১৫ বৎসর।
বরদোয়া	২১ বৎসর।		(মাধব সম্মিলন)।
তীর্থ-ভ্রমণ	১২ বৎসর।	কপলা	৬ মাস।
বরদোয়া	২১ বৎসর।	পাৎলন্দি	৬ মাস।
			(নারায়ণ-ঠাকুর-সম্মিলন)।
কোমরছেদা	৬ মাস।	কুমার কুচি	১ বৎসর।
গাঙ্গ-মৌ	৫ বৎসর।	পাটবাউসী	১৬ বৎসর।
(জগদীশকর্ত্তৃক ভাগবত আনয়ন)।		(গুরু দামোদর ও হরিগুরু সম্মিলন)।	

"আতা-ভক্ত-সংবাদে" (২৬) শঙ্করদেবের জীবিতকাল ১০৫ বৎসর বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রামচরণ ঠাকুর প্রণীত (২৭) চরিত্র পুঁথি হইতে "তের মন্দ ছকুড়ি" এই পদ উদ্ধৃত করিয়া কোন কোন প্রবন্ধলেখক

(২৬) 'বিজয়া"—রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় "মহাপুরুষ ও শঙ্করদেব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২৭) এই রামচরণ ঠাকুর মহাপুরুষ মাধবদেবের ভাগিনেয়, শঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত রামদাসের পুত্র এবং চরিত্র-লেখক দৈত্যারি ঠাকুরের পিতা রামচরণ কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ইহার রচিত সমগ্র পুঁথি এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। স্থানে স্থানে ইহার ভণিতাযুক্ত পুঁথির যে যে অংশ পাওয়া যায়. ঐ গুলি একত্র সংযোজন করিয়া সমগ্র পুঁথির উদ্ধার করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, এই সুবৃহৎ পুথি শুদ্ধাচারে রক্ষা করিতে না পারিলে অনর্থ ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া কেহ উহা বহু লোকের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি কেহ কেহ সমগ্র পুঁথি এক স্থানে রক্ষার উদ্যম করেন্ নাই। এই পুঁথির রচয়িতা পূর্ব্বোক্ত রামচরণ হইলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রামাণ্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহার বর্ণনা এরূপ বহু বিস্তৃত যে, এরূপ বিশদ চরিত্র-গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী লেখকেরা কি জন্য ক্ষুদ্রতর চরিত্র-গ্রন্থ সকল রচনা করিলেন একথার মীমাংসা করা যায় না। আর একটি কথা কণ্ঠভূষণের চরিত্র-পুথিতে শঙ্করদেবের চরিত্র প্রায়শঃ মানবচরিত্ররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দৈত্যারি ঠাকুর শঙ্করদেবের ব্যবহারের জন্য এক দরজি কর্ত্তৃক চারিহস্তবিশিষ্ট জামা তৈয়ারি করিবার কথা উল্লেখ করিয়া অলৌকিক ব্যাপারের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন। আর রামচরণ ঠাকুরের রচিত পুথিতে অলৌকিক বৃত্তান্তের এরূপ বহুল সমাবেশ যে, এই গ্রন্থ পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়।

বলেন, শঙ্করদেবের জীবিতকাল 'তের কম ছয় কুড়ি' অর্থাৎ ১০৭ বৎসর। কেহ কেহ "দেড় মন্দ ছকুড়ি" এই পাঠান্তর সিদ্ধান্ত করিয়া ১১৮৷৷০ বৎসরে উপনীত হন। তাহা হইলে জন্মশক ১৩৭১ হয়।

দ্বিজ রামানন্দ প্রণীত চরিত্র-পুঁথিতে ১৩৭১ সাল জন্মকাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুঁথি শঙ্করদেবের পুত্র রামানন্দকর্তৃক রচিত নহে। ইহা ভবানীপুরিয়া গোপাল আতার পথাবলম্বী রামানন্দ নামে এক ব্যক্তির লিখিত। উহা মহাপুরুষীয় সন্ত সাধুর গ্রহনীয় নহে (২৮) পরবর্ত্তীকালে লিখিত রুদ্রযামল (২৯) ও চরিত্র-সংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শঙ্করদেবের জন্ম-শক ১৩৭১ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রামাণিক চরিত্রপুঁথিতে জন্মশকের অনুল্লেখহেতু ঐ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। "আতাভক্ত-সংবাদের" বিবরণী বিশ্বাস করিতে হইলে শঙ্করদেবের জন্মশক ১৩৮৫ হয়। তাহার সহিত প্রথমবার তীর্থ-ভ্রমণ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর যোগ দিলে ১৪৩১ শক পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ শকে অদ্বৈত্য-সভায় শঙ্করদেবের উপস্থিতি-সম্বন্ধে অপ্রত্যয় উপস্থিত হয় না। যাহা হউক, অনেকেই অধুনা ১৩৭১ শক শঙ্কর-দেবের জন্মশক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন এবং "আতা ভক্ত সংবাদে" ১৪ বৎসর বাদ পড়িয়াছে মনে করেন। তাঁহাদের মতে আলিপুখুরি ও বরদোয়ার তীর্থ ভ্রমণের পূর্ব্বে ১০ বৎসর ও বেহারে ২ বৎসর ৬ মাস এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ার সময় ১ বৎসর ধরিয়া মোট ১১৯ বৎসর হইবে। এই হিসাবে ৪৪ বৎসর বয়সের সময় শঙ্করদেবের প্রথম তীর্থযাত্রার কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

উপরোক্ত মন্তব্যসহ আতাভক্ত-সংবাদের বিবরণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তীর্থ-ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই শঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন

---

(২৮) ২য় ভাগ "জোনাকী" দ্রষ্টব্য।

(২৯) খ বাণ বিশ্ব বেদকে শশাঙ্ক গণিতেশাকে। শ্রীমৎ শঙ্করনামাসৌঽবতীর্ণঃ কলৌ যুগে॥
বিন্দু রন্ধ্র বেদ চন্দ্র শাকে শঙ্করসংজ্ঞকঃ। নবভাবং সমুৎসৃজ্য ভাদ্রমাসি হ্যগাৎপদম্॥
(রুদ্রযামালম্।)

শাকে শুভ্রাংশু সপ্ত জ্বলন শশিমিতৌ যোঽবতীর্ণো ধরিত্র্যাম্।
স শ্রীশ্রীশঙ্করঃ শ্রীহরি পদ-মগমৎ ব্যোমরন্ধ্রাব্ধি চন্দ্রে॥ চরিত্র-সংহিতা।

নাই। সম্ভবতঃ তিনি বহুকাল ভক্তিশাস্ত্রের চর্চ্চা ও গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন; ধুঞাহাটা বা বেলগুড়িতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ স্থানে শঙ্করদেব ১৬ বৎসর ছিলেন। ঐ সময় মধ্যে ভক্ত রামদাসের দীক্ষা ও মাধব-সম্মিলন হইলে পর শাক্তদিগের সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। বিপক্ষেরা রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া ফললাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু শঙ্করদেবও যে রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে। বিশেষতঃ তদানীন্তন আহম-রাজদিগের বিচার-প্রণালীর যেরূপ পরিচয় চরিত্র-পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ রাজ্যে নিরুপদ্রবে বাস করা সম্ভবপর ছিল কি না সংশয়স্থল। প্রধানতঃ যে ঘটনায় শঙ্করদেব ধুঞাহাটা পরিত্যাগ করেন তাহা এই;—আহমরাজ হাতী ধরিবার জন্য খেদা পাতিয়া ভুঞাদিগকে লোকজনসহ গড় রক্ষা করিতে আদেশ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গড় ভাঙ্গিয়া হাতী পলায়ন করে। তখন রাজা ভুঞা-দিগকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দেন। এই সংবাদ পাইয়া সকলেই পরিজন-দিগকে নৌকায় তুলিয়া পলাইতে লাগিল। শঙ্করদেব পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আহমেরা আসিয়া পড়িল। কথিত আছে, এই সময় শঙ্করদেব এক লম্ফে একটা চৌদ্দ হাত গড়খাই পার হইয়া গিয়াছিলেন। আহ-মেরা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না; কিন্তু তাঁহার জামাতা হরি ও মাধবদেবকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে মাধব হরিকে কহিলেন, "শত্রুরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ-সংহার করিবে। যদি অগ্রে তোমায় বধ করে, আমি তোমায় হরিনাম শুনাইব, আর যদি প্রথমে আমাকে হত্যা করে তবে হরিনাম শুনাইবার ভার তোমার উপর রহিল।" আহমেরা মালা ও কমণ্ডলুধারী দেখিয়া মাধবদেবকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু হরিকে খড়্গাঘাতে নিহত করিল। কথিত আছে, হরির ছিন্ন মুণ্ড "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়াছিল।

মাধবদেব আহমদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শঙ্করদেব ও অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শঙ্করদেবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার মুখে জামাতার শোচনীয় পরিণাম ও অন্তিমকালীন দৃশ্যের বর্ণনা শুনিয়া শঙ্করদেব দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শঙ্করদেব ধুঞাহাটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র-পুঁথিতে দেখা যায়, রাজা নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ চিলারায় সসৈন্যে অগ্রগামী হইয়া আহমদিগের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা নরনারায়ণ পরম ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও কীর্ত্তিকাহিনী লোকমুখে শুনিয়া দলে দলে লোক উপর আসাম হইতে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবার জন্য চলিয়া যায়। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

ধুঞাহাটা হন্তে শুনে লোক সমাচার। গীত কবিত গুণ শুনয় রাজার।
তার রাজ্যে যাইবে মন সমস্ত প্রজার॥
সেই সময়ত নরনারায়ণ রাজা। মারিতে আসাম রাজ্য সাজি লৈল প্রজা॥
আগ হুয়া লোক পাছু করি বাজু দিল। আপন ইচ্ছায় লোক সমস্তে আসিল॥

ইতিহাসে দেখা যায় ১৪৬৮ শকে রাজা নরনারায়ণ আহম রাজ্য আক্রমণ করেন। "আতা-ভক্ত-সংবাদের" বিবরণ অনুসারে শঙ্করদেব ১৪৭২ শকে অর্থাৎ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার ৪ বৎসর মধ্যে ধুঞাহাটা ত্যাগ করেন। শঙ্করদেবের জন্ম শক ১৩৭১ বলিয়া গ্রহণ করিলে ধুঞাহাটা ত্যাগের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১০০ বৎসর হয়; সুতরাং আতা-ভক্ত-সংবাদের বিবরণ ইতিহাস ও চরিত্র-পুঁথির অবিরোধী বলিয়া অধিকতর নির্ভর যোগ্য ইহাই প্রতীতি থাকে এবং শঙ্করদেবের জন্ম শক ১৩৭১ বলিয়া গ্রহণ করিতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা যে সংশয় প্রকাশ করেন, তাহা অহেতুক বোধ হয় না।

শঙ্করদেবের যতগুলি চরিত্র পুঁথি আছে, তাহার প্রত্যেক খানিতেই তৎকর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন বর্ণিত হইয়াছে; আর উক্ত হইয়াছে যে তিনি ধুঞাহাটা হইতে বড়পেটায় গেলে পর অনেক শিষ্য সহকারে তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন।

"আতা-ভক্ত-সংবাদ" অনুসারে ১৪৭২ শকের পরে এই ঘটনা ধরিতে হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ ১৪৬৫ শকে চৈতন্যের তিরোভাব হইয়াছে। সুতরাং ধুঞাহাটা হইতে শঙ্করদেব কর্ত্তৃক তীর্থযাত্রা কল্পনা না করিলে তৎকর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন অঙ্গীকার করা যায় না। তাঁহার জন্ম শক ১৩৭১ ধরিলে বড়পেটা হইতে তীর্থযাত্রা করিয়া চৈতন্যদর্শন আরও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেহ কেহ

অনুমান করেন যে শঙ্করদেবের জীবনের অনেক ঘটনার ন্যায় তৎকর্ত্তৃক চৈতন্য-দর্শন তাঁহার চরিত্র-পুঁথিতে বড়পেটা গমনের পর বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহা পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি, শ্রীচৈতন্য অবতাররূপে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বেই শঙ্করদেব শান্তিপুর ত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানচর্চ্চায় বিরত থাকিয়া গৌরহরি শুধু নামকীর্ত্তন প্রচারের যে উদ্যম করেন, শঙ্করদেব তাহার প্রতিরোধী ভাব লইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মহাপুরুষীয় সাহিত্যে নদীয়ার উল্লেখ ভূরি ভূরি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কুত্রাপি নদীয়া ও তদ্দেশীয় শিক্ষার প্রতি সম্ভ্রমব্যঞ্জক ভাবের বর্ণনা দেখা যায় না। বরং তদ্বিপরীত ভাবই লক্ষ্য হইয়া থাকে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। যে পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের সভায় চণ্ডীবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, উক্ত হইয়াছে, তিনি নদীয়া হইতে আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যার পরিচয় প্রদর্শনার্থ রাশীকৃত পুঁথি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিতেন! গয়াপাণি শঙ্করদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া "তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থই করিতে পারিলেন না। উক্ত হইয়াছে, ইনিও নবদ্বীপেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করদেব স্বয়ং নবদ্বীপ ও তথাকার শিক্ষা ও লোকচরিত্রসম্বন্ধে এবম্প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এমন প্রমাণ নাই। তিনি প্রাপ্ততেজ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ষোড়শাক্ষরী নামমন্ত্র (৩০) আসাম হইতে বিদূরিত করিয়া চতুরক্ষর মন্ত্র (৩১) প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তরঙ্গ আসামে আসিয়া সাগরতটপ্রহত উর্ম্মির ন্যায় ফিরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং শঙ্করপথাবলম্বী মহাপুরুষীয় লোকেরা নদীয়ার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীলতা দেখাইলে উহা অস্বাভাবিক মনে করিবার হেতু নাই। চরিত্র-পুঁথিতে আছে, শঙ্করদেব রূপ-সনাতন প্রেরিত প্রচারকের মুখে বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত শুনিয়া বৃন্দাবন দর্শনে উৎসুক হন। শিষ্যদিগকে বৃন্দাবন-গমনে উদ্বুদ্ধ করিতে তিনি বলিয়াছিলেন :—

(৩০) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

(৩১) রামনারায়ণ কৃষ্ণহরি।

আসা একেলগে যবে যাঁও বৃন্দাবন। আছে বৃন্দাবন দাস হয়োঁ দরিশন॥
যি সব ভক্তির ভাগ করিছো বেকত। দুই মুই পুছি তাস্ত লৈবাংহা সম্মত॥(৩২)

এতদ্বারা রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির প্রতি তাঁহার যথোচিত শ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ শঙ্করদেব ধর্ম্মপ্রচারে চৈতন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তৎপ্রতি অশ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তাঁহার চরিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র অ'ছন্ত যথাত। ভৈলন্ত শঙ্কর-সূর্য্য প্রবেশ তথাত॥

এই বাক্যটিতে উভয় মহাত্মারই স্বরূপ যথাসঙ্গত উক্ত হইয়াছে বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য চন্দ্রের ন্যায় কোমল মধুরদর্শন—প্রেমের গলিত ধারা, আর শঙ্কর সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপূর্ণ উজ্জ্বল—জ্ঞানের প্রখর রশ্মি। শঙ্করদেবের জীবদ্দশাতেই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তরঙ্গ আসাম হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত এবং চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শঙ্করদেব তাহা অনবগত ছিলেন না, কিন্তু দেখা যায়, রূপ-সনাতন ও বৃন্দাবন দাসের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ অধিক, ইহার কারণ কি? রূপ ও সনাতনই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতের লেখক। সুতরাং ইঁহারা সকলেই শঙ্করদেবের ন্যায় জ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত; কেহই জ্ঞানশূন্য ভক্তিমার্গের পথিক নহেন।

শঙ্করদেব কর্ত্তৃক চৈতন্যদর্শন উল্লেখ করিয়া কণ্ঠভূষণ লিখিয়াছেন :—

চৈতন্য গোসাইক তথা ভৈল দরিশন। দুইকে দুই না চাহিলা নাহিকে সম্ভাষণ॥
মুহূর্ত্তেক মানে দুয়ো চাহি আছিলন্ত। নিবর্ত্তিয়া আসি বাসা ঘরে রহিলন্ত॥

দৈত্যারি ঠাকুর এই বৃত্তান্ত আরও কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন :—

শঙ্করর নাম শুনি কৃষ্ণচৈতন্যর। মিলিল আনন্দ বাঝ ভৈলন্ত মঠর॥
দুয়ার মুখত আছি রহিলন্ত চাই। দুয়ো নয়নর নীর ধারে বহি যাই॥
শঙ্কররো নয়নর নীর বহে ধারে। পথ হৈতে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে॥

(৩২) মাধবদেবের কৌশলে শঙ্করদেব বৃন্দাবন গমনে নিরস্ত হন। যদি তিনি যাইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আসাম ও বঙ্গের বৈষ্ণব-সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য দূরীভূত হইয়া উভয় সম্প্রদায়ের একীকরণ হইয়া যাইত। অন্ততঃ বাঙ্গলা বৈষ্ণব-সাহিত্যে শঙ্করদেব ও তদনুসঙ্গী ভক্তদের বিবরণী পাওয়া যাইত। অন্যপক্ষে মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের বিবরণ সম্বন্ধেও দৈন্য লক্ষিত হইত না।

কতক্ষণ দুইকো দুই চাই প্রেমমনে। পশিলা মঠত গৈয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে॥
নমাতিলা দুইকো দুই নিদিলা উত্তর। পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্কর॥

দ্বিজ রামরায় প্রণীত দেব দামোদরের চরিত "গুরুলীলা" গ্রন্থে আছে :—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর। কৃষ্ণ যে চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্ব্বত ব্রহ্ম হরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত॥
সেই কথা শুমরি শঙ্কর মৌন ভৈলা। রাম রাম গুরু সমে উচর চাপিলা॥
অবনত হুয়া দুই নমিলা সাক্ষাৎ। পূর্ব্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত॥
শঙ্করর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী। কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে। এক যে শরণ ধর্ম্ম চৈতন্যর স্থানে॥

সুপ্রসিদ্ধ কথাভাগবতকার দেব দামোদরের শিষ্য পরমভাগবত ভট্টদেব কবিরত্ন-বিরচিত "সৎসম্প্রদায়-কথা" আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"শ্রীশঙ্করে পূর্ব্বে দামোদর-মুখে চৈতন্যের বার্ত্তা শুনি দেখিবে ইচ্ছা আছিল ; বিষয় ব্যগ্রে না পাইল। পাছে রাম রায় বড় বাক্ গোমস্তা পাতি রাম রাম গুরু সনে মণিকুটে গৈলা। পাচে মাধব দর্শন হুই রত্নপাঠকের মুখে ভাগবত শুনি বোলে হে রত্নপাঠক, এহি শাস্ত্র ইঠাইত কোন প্রবর্ত্তাইল। পাঠকে বোলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তাইল। শঙ্করে বোলে এখন প্রভু চৈতন্য কত আছে। পাঠকে বোলে এই গোফাতে আছিল ; এখন যাই ওড়েবাত আছে। এই শুনি শঙ্করে রাম রাম গুরু সহিতে পশ্চিমে চলি ওড়েবাক গৈলা। পাচে ঠাকুর দর্শন হুই চৈতন্যের মঠর দ্বারে গৈলা। তাতে ব্রহ্ম হরিদাস দেখি বোলে তোরা দুই কৈত থাকা। শঙ্করে বোলে আমি পূর্ব্বদেশী কায়স্থ এন্তে রাম রাম ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে দেখিতে চাঁও। ব্রহ্ম হরিদাস বোলে এখন মহাপ্রভুব্রতী সম্ভাষণা নকরে, কমনে দেখিবা। যদি দেখিতে চোঁবা কিছো বিত্ত ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভা। কীর্ত্তনর লোভে ওলাইতে দেখিবা। এই শুনি শঙ্করে বিত্ত ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভিলা। পাচে মহাপ্রভু তাতে ওলাই বহু মহন্তর মধ্যত দুই প্রহর নৃত্য করি অলক্ষিতে গৈলেক। পাচে শঙ্কর তাঙ্ক লক্ষিবে না পারি পুনু হরিদাসত পুচিলা ; বোলে হে ব্রহ্ম হরিদাস প্রভুক চিনি না পাইলো তান কি লক্ষণ। হরিদাসে বোলে প্রভুর রূপ গৌরাঙ্গ, মুণ্ডিত মুণ্ড গলত কণ্ঠি হাতে জপমালা,

কটিত কপিন, মুখে হরিবোল, প্রেমে বিভোল, এহি লক্ষণ। তাঙ্ক দেখিতে আউর উপায় কহো। যেখন প্রাতসে ঠাকুরর জলশঙ্খ বাদ্য হয়, তেখনে দ্বার মেলে। সেহি বেলা মহাপ্রভু সাগর স্নানে যাই। সেহি বেলা দ্বারত থাকি তুয়ো অবশ্যে দেখিবা। এহি শুনে শঙ্করে রাম রাম গুরু সাহিতে প্রাতসে যাই দ্বারতে রহিল। পাচে জলশঙ্খ বাদ্য হৈল, কপাটো মেলিল। সেহি সময়ে চৈতন্যো কমণ্ডলু লই দ্বারর ওলাই রামরামর মাথে উঝট লাগিল; তাতে মহা-প্রভু চারিনাম উচ্চারিল। সেই তান মন্ত্র ভৈলা। পাচে সাগরত স্নান করি ফিরি আহন্তে তান স্বরূপ দেখি পাব্র খোজে প্রণাম করি ব্রহ্ম হরিদাসক বোলে গুরু তোমার প্রসাদত প্রভুক দেখিলো, জন্ম সাফল ভৈল। এখন এই খানি প্রভুত পোচা কলিত কাত ভক্তি রহিবেক,আর সিদেশত বা হরিনাম কোনে দিবেক। এহি শুনি হরিদাসে চৈতন্যত পুছিলে বোলে মহাপ্রভু পূর্ব্বদেশী দুই প্রাণী আসি কাতরে পুচিছে বোলে কলিত কাত ভক্তি রহিবেক; আমাক বা কি আজ্ঞা করে; সিদেশত হরিনাম কোনে দিবেক। এহি শুনি চৈতন্যে বোলন্ত, হে ব্রহ্ম হরিদাস, ভক্তি প্রেমরস উচ্চত ন বহে নামত বহে। ব্রতেকে নিষ্কিঞ্চন জনত ভক্তি রহিবেক। হের দেখাঁও, এহি বুলি কমণ্ডলুর জল গহ্বরে ঢালিল। পাচে উচ্চে ন বহি জল নামে রহিল। আরু বোলন্ত সিদেশক গৈতে শঙ্করক জানো। সি বর মনুষ্য, তাঙ্ক আমার এই আজ্ঞা। আমার শিষ্য কণ্ঠভূষণর মুখে ভাগবত শুনি শঙ্করে গীত পদ করিবেক,আরু গজপতি রায় পুরুষোত্তমে করা সাতশ শ্লোকর নামমালিকা খেনির ঘোষা করিবেক। আর রাম রাম বিপ্রকে জানি, তাঙ্ক এই আজ্ঞা য চারি নাম পাইছে, তাকে ব্রহ্ম বুলি ধরিবেক, আর এই বত্রিশ শ্লোকে শ্রবণ পটলখানি রাম রামে নি মোর শিষ্য দামোদরর হাতত দিবেক। সেই পটলক্রমে সিদেশত হরির নাম দিবেক, এই আমার আজ্ঞা কই পঠাব্‌। পাচে ব্রহ্ম হরিদাসে ওলাই আহি চৈতন্যর এই সকল আজ্ঞাকে শঙ্করত মামরামতো কই শঙ্করকো দিলে নামমালিকা রাম রামক দিলে শরণ পটলখানি। পাচে দুখানি দবনার মালাদি দুইকো পঠালে। পাচে শঙ্করে রাম রাম গুরু সাহিতে চৈতন্যর মঠক প্রদক্ষিণে প্রণামি পুনু ঠাকুরকো প্রণামি তান প্রসাদ নির্ম্মাল্য লই কামরূপে রাম রায় বরুয়াত সকল বার্ত্তা কই পাটবাউসীত গৃহ বান্ধি প্রতিমা থাপিলা। পাচে কণ্ঠভূষণক আনি ভাগবত প্রসঙ্গ পাতি দামোদরক বার্ত্তা দিলা।"

কণ্ঠভূষণ, দৈত্যারি, দ্বিজ রাম রায়,ভট্টদেব ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসাময়িক লেখক। ইহাঁদের রচনায় অগ্রপশ্চাৎ নির্ণয় করা সুকঠিন। আর ইহাঁদের প্রত্যেকেই স্বনামধন্য চরিত্রবান সাধুপুরুষ। ইচ্ছাপূর্ব্বক ইঁহারা স্ব স্ব রচনায় মিথ্যা কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন, এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। মোটামুটি চারিজনের লেখায় বৃত্তান্ত ঘটিত সামঞ্জস্যও আছে। যথা—

(১) শঙ্কর ও চৈতন্যের পরস্পর দেখা হইয়াছিল, কিন্তু কথোপকথন হয় নাই।

(২) এই সাক্ষাৎ উড়িষ্যাতে হইয়াছিল।

(৩) শঙ্করদেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের নিকট কোন উপদেশ লাভ করেন নাই।

এতদতিরিক্ত যে সকল বৃত্তান্তঘটিত অনৈক্য আছে, তাহার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এই লেখকদের মধ্যে সকলেই শঙ্করদেব-সম্বন্ধীয় কথা অন্যের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং শুনা কথায় যে কিছু কিছু অমিল থাকিবে ইহাতে বিচিত্রতা কি? ফলতঃ শঙ্কর ও চৈতন্যের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে উহা উড়িষ্যাতেই হইয়াছিল। আর এই সাক্ষাতের পর শঙ্করদেব উপর-আসামে ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাৎ পাটবাউসীতে গিয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লইলে, এই বৃত্তান্ত অনৈতিহাসিক মনে করিবার কোন হেতুই থাকে না। ভট্টদেব চৈতন্য দর্শনের পর আসামে প্রত্যাবর্ত্তন ও পশ্চাৎ পাটবাউসী গমন স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় লেখকেরাও শ্রীচৈতন্যকে শঙ্করদেবের দীক্ষাগুরু বা উপদেষ্টা বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে, শ্রীক্ষেত্রে দূর হইতে সংকীর্ত্তন-মধ্যে নৃত্যপরায়ণ গৌরের প্রেমাবেশ দেখিয়া শঙ্করদেব জ্ঞান-চর্চ্চায় বীতস্পৃহ হন এবং কীর্ত্তন,বড়গীত ও ভাওনা প্রভৃতির প্রচারে অধিকতর অনুরাগী হইয়া উঠেন। এই কথার সমর্থনের জন্য কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। চৈতন্য-দর্শনের অব্যবহিত পরেই দৈত্যারি ঠাকুর শঙ্করদেবের প্রেমের আবেগে পুনঃ পুনঃ আত্মবিস্মৃতির ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে রাম রায় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শঙ্করদেব রাম-চরিত্র-বর্ণন করিতেছিলেন, কিন্তু কোন্ সময়ে উহা ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কথা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার

স্মরণ নাই! কৃষ্ণনাম লইতেই প্রেমে তাঁহার প্রাণ আকুল হইতেছে! "ভক্তি-রত্নাবলী" পুঁথি আনীত হইলে পর উহাতে এক কৃষ্ণের শরণ কোথায়?" এই বলিয়া শঙ্করদেব অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পশ্চাৎ উহার শেষাংশ পঠিত হইলে পর উহাতে এক কৃষ্ণের শরণ দেখিয়া তিনি ঐ পুঁথি মস্তকে লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রেমিক কতক্ষণ শুষ্ক শাস্ত্র-চর্চ্চায় তৃপ্ত থাকিতে পারেন? প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিকের এমন দিন আপনিই উপস্থিত হয়, যখন নাম গ্রহণ মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে। ক অক্ষর দেখিতেই কৃষ্ণ নামে দেহ পুলকিত হইয়া উঠে!

শঙ্করদেবের অনুসঙ্গীদের মধ্যেও অনেকেই মহা প্রেমিক ছিলেন। স্বয়ং শঙ্করদেব রাম রাম গুরুকে "মহাপ্রেমধারী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, একদা কীর্ত্তনের মহাধুম লাগিয়া গিয়াছে। রাম রাম গুরু ও রামদাস এই দুইজন ওঝা কীর্ত্তন করিতেছেন, মাধব দেব তাল ধরিয়াছেন আর আনন্দমূর্ত্তিস্বরূপ শঙ্করদেব সাক্ষাতে রহিয়াছেন, সমস্ত লোক প্রেমানন্দ-রসে বিভোর তখন :—

কংশ বধ ঘোষা রাম রাম গুরু গান্ত।
সেহি সময়ত প্রেম উপজিল তান্ত॥
অম্বষ্ঠ সহিতে কুবলয় হাতী মারি।
ভৈলা রঙ্গশালাত প্রবেশ রাম হরি॥
কান্ধত হস্তি দান্ত শিশুগণ সঙ্গে।
ওহি পদ রাম রাম গুরু গান্ত রঙ্গে॥
সমস্তে লোকক প্রেম পরশি আছয়।
তান গায়ে চেতন গিয়ান নাহি কয়॥
প্রেমানন্দ সমুদ্রত মজিল সমুলি।
কান্ধত লৈলন্ত এক গোটা তম্ভ তুলি॥
স্বভাবে বাহিবে দুই মুনিষে পারয়।
আরু গোড় পুতি ঘরে লাগায়া আছয়॥
এক ঠেলা মারি তাক দুই হাতে ধরি।
কৌতুকে কান্ধত লৈয়া যান্ত লীলা করি॥

ভক্ত রামদাসও মহাপ্রেমিক ছিলেন। একদা প্রহ্লাদ-চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রহ্লাদ ভাবাবেশ হয়। সেই সময় কীর্ত্তন-ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। "এই ত প্রহ্লাদের অগ্নিকুণ্ড" এই বলিয়া তিনি তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়েন।

প্রেমে পরশিছে নাহি গাবত চেতন। অগনিত লৈয়া পড়িলন্ত তেতিক্ষণ॥
তাতে পড়ি আনন্দতে পদক বোলন্ত। সমস্ত সমাজে হরি হরি উচ্চরন্ত॥

সঙ্গীতের সম্মোহিনী-শক্তি, রূপ ও ভক্তির সহিত যে বাঙ্গলাদেশে জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। সেই কীর্ত্তনের আদিকালে যখন গৌরহরি হাতে হাতে তালি দিয়া প্রথমে—

"হরি হরয়ে নমঃ নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

এই পদে রাগ যোজনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুই একটি অন্তরঙ্গ লোক উহার মাদকতায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে গৌরের দলে সঙ্গীতবিশারদ দুই একটি লোক আসিয়া জুটিল। কেহ এক জোড়া মন্দিরা আনিয়া ঐ রাগে তাল যোজনা করিয়া দিল। কেহ শঙ্খ আনিল, কেহ করতাল লইল; ক্রমে মৃদঙ্গও আসিল। এই সকল প্রীতিকর বাদ্যযন্ত্রের সুস্বর-লহরীর দ্বারা বর্দ্ধিত-মাধুরি সংকীর্ত্তনের মধ্যে যখন 'সোণার বরণ' গৌরের নৃত্য আরম্ভ হইল, তখন উহার মাদকতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল! ক্রমে ক্রমে যখন রাগ-রাগিণী ও তালের বৈচিত্র্য এবং ভক্তদিগের রচিত পদের নব নব ভাবের দ্বারা গৌরের নৃত্য চালিত হইতে লাগিল, তখন উহার আকর্ষণীশক্তি সহস্র গুণ বাড়িয়া গেল! সেই মন্ত্র ও জপের যুগে গৌরের সংকীর্ত্তনের দল যখন প্রথম পথে বাহির হইল. তখন লোকে বিস্ময় ও বিরক্তিসহকারে বলিতে লাগিল, "এরা এ সব কি পাগলামি করিতেছে! কৃষ্ণনাম লইতে হয়. ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে নাম জপ কর, এত উচ্চ চীৎকার কেন?" কিন্তু হায়! এ ভাব কতক্ষণ থাকিল! যাহারা একটু কাণ পাতিয়া শুনিল, চক্ষু মেলিয়া দেখিল, তাহারাই আকৃষ্ট হইল! মন্ত্র-জপ গোপনেই কর্ত্তব্য মনে করিয়া যাহারা কাছে আসিল না, তাহারা রক্ষা পাইল। যে নিকটে আসিল সেই মজিল! পণ্ডিতমণ্ডলী নিম্বফল সদৃশ তিক্ত শাস্ত্ররাশি ঘাঁটিতে লাগিলেন, আর গৌরের ভক্তদল সুধা-সদৃশ কৃষ্ণ-প্রেমরস পান করিতে লাগিলেন। দেশের অনেক জগাই-মাধাই উদ্ধার হইয়া গেল। এখন গৌরের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে নানা আবিলতা সঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এখনও সংকীর্ত্তন-প্রভাবে দুই চারিটি জগাই-মাধাই উদ্ধার না হইতেছে, এমন নহে।

আসামে শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন মূলতঃ বাঙ্গলা দেশের সঙ্কীর্ত্তন হইতে

কিঞ্চিৎ বিভিন্ন (৩৩)। কিন্তু সেদেশে শঙ্করদেবই যে সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন ও বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে উহাই প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই। শঙ্করদেব কীর্ত্তনের কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তদ্রচিত নানা রাগযুক্ত বহুসংখ্যক কীর্ত্তন, বড়গীত, নাটক প্রভৃতিই তাহার নিদর্শন। কীর্ত্তনের প্রভাবে আসামে হরিনাম কিরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিরক্ষর চণ্ডাল পর্য্যন্ত মাছ ধরিয়া নৌকায় আসিতে আসিতে সুস্বরে কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আসিতেছে শুনিয়া শঙ্করদেব বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছিলেন! আর একদিন পথে যাইতে যাইতে শঙ্করদেব শুনিলেন, দুইটি রাখাল বালক সুললিত স্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছে! শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! তাঁহার প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের মহিমায় চণ্ডাল ও রাখালবালক পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি প্রেমাশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন :—

কিনো মহাভাগ্য আজি লোকক মিলিল। বালকো বান্ধব কৃষ্ণ বুলিয়া জানিল ॥

পঞ্চম প্রবন্ধ

ধুপ্রাহাটা হইতে শঙ্করদেব একেবারে ভক্তদলসহ বড়পেটায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন নহে। ক্ষুদ্র নৌকায় সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও পরিজনবর্গকে তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় রওনা হইতে হইয়াছিল। পাঁচ সাত ঘর মাত্র ভক্ত তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। অন্যেরা

(৩৩) আধুনিক সংকীর্ত্তন ও বড়গীত দেখিয়া চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন ও শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের তুলনা সমীচীন নহে। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, অন্য পক্ষে শঙ্কর-মাধব প্রবর্ত্তিত বড়গীত প্রায়শঃ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের মধ্যে শব বাহনকালে "হরি হরয়ে নমঃ নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ" ইত্যাদি যে রাগে গীত হয়, তাহা অনেকটা চৈতন্যের সমকালীন সংকীর্ত্তনের অনুরূপ। উহার সহিত আমাদের বড়গীতের পার্থক্য অতি সামান্য। আদিকালেই আসামের কীর্ত্তনে "শ্রীখোল" ও উদ্দণ্ড নৃত্য বর্জ্জিত হইয়াছিল। প্রাচীন মহাপুরুষীয় সাহিত্যে দেখা যায়, মৃদঙ্গের উচ্চরোল শুনিয়া দেব দামোদরের গাত্রে জ্বর আসিয়াছিল।

পশ্চাৎ গিয়াছিলেন। দুইটি নিঃসম্বল ভক্ত কাহারও নৌকায় স্থান না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে বসিয়াছিল। মাধবদেব উহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় নৌকার কিছু দ্রব্য নদীতে ফেলিয়া দিয়া নৌকায় ঐ ভক্ত দুইটির স্থান করিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবদিগের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ প্রীতিবন্ধন হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শঙ্করদেব বর্ত্তমান বড়পেটা অঞ্চলে নৌকা ত্যাগ করিয়া পালন্দী (৩৪) নামক স্থানে রহিলেন। মাধব বরাদি গ্রামে (৩৫) বুঢ়াদলৈর গৃহে কিছুকাল থাকিয়া নিজ বড়পেটাতে বাস করিলেন। দুই তিনবার স্থান ত্যাগ করিয়া শঙ্করদেব "জগৎ পবিত্র পাটবাউসী" সত্রে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে ঐ স্থানের অবস্থা কিরূপ ছিল কণ্ঠভূষণ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

> বেত বাঁশ তারা বনে ব্যাপি আছে বড়পেটা গ্রাম ঘুরি।
> কোন খানে ঘর বাড়ী সাজাইবন্ত শঙ্করে চাহন্তে ফুরি॥
> গণক পারাত ঘর সাজাইলন্ত কতোদিন বঞ্চি তাত।
> কুমার পারাত ঘর সাজাইলন্ত মিলিল দুঃখ মনত॥
> তাহার দাক্ষিণে ঘর সাজাইলন্ত মনত আতি হরিষে।
> পাটবাউসী সত্র নামত প্রসিদ্ধ সর্ব্বজনে যাক ঘোষে॥

ক্রমে নানা স্থান হইতে ভক্তগণও তথায় আসিতে লাগিলেন।

> রাম রাম গুরু গোঁসাই দামোদর হরি গুরু বসিলন্ত।
> জয়ন্তি মাধব রতিকান্ত দলৈ রাম রায় আসিলন্ত॥
> হরিদাস বাণিয়া বুঢ়া দৈবজ্ঞ আর মহাকালী রাম।
> উহার গোবিন্দ বলভদ্র আরু বসিলন্ত বলরাম॥

(৩৪) এই স্থান বর্ত্তমান বড়পেটার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে 'চূণপড়া' ভিটি আছে। সম্প্রতি ঐ ভিটিতে ১৪ হাত দীর্ঘ ১০ হাত প্রস্থ ইটের দেওয়াল আছে। চারি কোণে চারিটি গম্বুজ। পশ্চিমদিকে দ্বারহীন প্রবেশ-পথ। উহার উপরেও দুইটি গম্বুজ। দ্বারের দুই পার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত জয়-বিজয়ের প্রতিমূর্ত্তি। এই ভিটিতে প্রত্যহ রাত্রিতে প্রদীপ দেওয়া হইয়া থাকে।

(৩৫) বর্ত্তমান বড়পেটা সত্র হইতে এই স্থান প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী।

ডম্বুরিয়া গোবিন্দ কণ্ঠ যে ভূষণ গোকুলচাঁদ বসিলন্ত।
চান্দসাই আরু কেরোলা বাঢ়ৈ আসিলা দাস অনন্ত ॥
রত্নাকর কালি বিশ্বাস কলাই ভক্ত সমে রঙ্গ মনে।
শঙ্করর পাশে গৈয়া বসিলন্ত প্রণমিয়া একমনে ॥

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্করদেবের পূর্ব্বপরিচিত; অনেকে নূতন দীক্ষিত। পালন্দীতে থাকা কালে ভক্ত নারায়ণ দাস শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ—পালন্দীতে ভাস্কর নানক এক সঙ্গীতবিশারদ সুকণ্ঠ বিপ্র শঙ্করদেবের নিকট আসেন ও তৎকৃত কীর্ত্তন রাগরাগিণী সহ গাহিতে অভ্যাস করেন। ঐ সকল কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি শঙ্করদেবের উপদেশে পরম কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন। শঙ্করদেবের সহিত কিছুকাল কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণ দ্বারা পবিত্র দেহ হইতে মানস করেন এবং শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করেন।

বরনগর (৩৬) গ্রামে ভবানন্দ নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ বণিক ছিলেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্য প্রবর্ত্তিত (৩৭) ষোলনাম মন্ত্র গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ভাস্করের মুখে শঙ্করদেবের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা ত্যাগ করিয়া পালন্দীতে আসিয়া শঙ্করদেবের সন্দর্শন লাভ করেন। ইনি শঙ্করদেবের প্রভাবে এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্র দণ্ডবৎ প্রণিপাত করেন। তাঁহার ঈদৃশ দৈন্য দেখিয়া শঙ্করদেব নারায়ণ স্মরণ করেন, এবং পশ্চাৎ ভবানন্দ শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার নারায়ণ দাস, এই নামকরণ করেন। ইনি শঙ্করদেবের একজন প্রধান ভক্ত। চরিত্র-প্রভাবে ইনি ব্রহ্ম হরিদাসের

(৩৬) এইস্থান এখনও এই নামে পরিচিত।

(৩৭) এখনও বড়পেটা অঞ্চলে স্থানে স্থানে চৈতন্যপন্থীদের সত্র আছে। ইঁহারা বলেন, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চারিদিকে চারিপুত্র প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন এতদ্দেশে আসিয়া প্রচার করিয়া ছিলেন। কথিত আছে, প্রচারান্তে অদ্বৈত-তনয় স্বীয় বাসগৃহের অভ্যন্তর হইতে অন্তর্দ্ধান করেন। চৈতন্যপন্থীদের বিশ্বাস, তিনি একস্থানে অন্তর্দ্ধান করিয়া অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করেন। এইহেতু তাঁহার তিরোভাব-তিথিতে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হয় না। উৎসবমাত্র হইয়া থাকে।

সহিত তুলনীয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই উভয়েই প্রহ্লাদের অবতারস্বরূপ কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন (৩৮)। ইঁহার যত্নে বহুলোক শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। জয়ন্তীর মাধব, পরমানন্দ, শিমলীয়ানিবাসী শ্রীরাম, বলরাম, মুকুন্দ, গোপাল ও মাধব এই তিন ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেই ভক্ত নারায়ণ দাস কর্ত্তৃক শঙ্কর সকাশে আনীত হইয়াছিলেন।

এই সকল ভক্তদিগের দীক্ষা-গ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পরমানন্দ এক বৃদ্ধার পুত্র। কীর্ত্তনে ইহার অনুরাগ উপস্থিত হইলে পর ভক্ত নারায়ণ দাস ইহাকে তিন কাহন কড়ির ঋণ-দায় হইতে মুক্ত করিয়া সত্রে আনেন।

শিমলীয়ার শ্রীরামের সংসারে আর কেহই ছিল না। ঘরে ঘরে স্বেচ্ছায় কাজ করিয়া ইহার দিনপাত হইত। ইহার দিন বৃথা যাইতেছে দেখিয়া নারায়ণ দাস ইহাকে সত্রে আসিতে কহেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কহিল, "এক স্থানের ধান কাটিয়া দিতে প্রতিশ্রুত আছি। উহা না করিয়া কোথাও যাইতে পারি না।" ইহার সাধুতার এইরূপ পরিচয় পাইয়া নারায়ণদাস ইহাকে যথাসময়ে সত্রে আনিলেন।

দ্বিজ চক্রপাণি ভক্ত নারায়ণদাসের কুলপুরোহিত ছিলেন। তাঁহার শিশু পুত্র রাম পীড়িত হইলে পর চিকিৎসার জন্য ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে পত্নী ও শিশুকে রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণী ভক্ত নারায়ণ দাসের গৃহে বিস্তর কৃষ্ণকথা শুনেন শিশু আরোগ্য হইলে পর গৃহে গিয়া তিনি স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন :—

শুদ্রর মুখত আমি কথাক শুনিলো। আমার ব্রাহ্মণ জন্ম কি সক সাধিলো॥

চক্রপাণি পত্নীকে ধমকাইয়া বলিলেন—"ভালত কৃষ্ণ ভক্তির কথা বলিতেছ! তোমার পরামর্শে ৬০।৭০ ঘর যজমান ত্যাগ করিলে কি খাইব!" এই বলিয়া তিনি একখানি পত্রে গোটা পঁচিশেক শ্লোক লিখিয়া শঙ্করদেবের সভা জয়

(৩৮) "ভক্ত নারায়ণদাস" প্রবন্ধে ইহার বিশেষ বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৯ সালের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

করিতে চলিলেন। পথে মাধবদেব পত্রখানি দেখিয়া তাহার নিম্নে আর একটি শ্লোক লিখিয়া দিলেন। ঐ শ্লোকটি পাঠ করিয়া চক্রপাণি "বুঝিলাম" এই বলিয়া পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং ভক্ত নারায়ণদাস ও মাধবদেবের সহিত শঙ্কর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া রাম রাম গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। চক্রপাণির ৬০।৭০ ঘর শিষ্যও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল। এই চক্রপাণিই চরিত্র-লেখক কণ্ঠভূষণের পিতামহ॥

মাধবদেব ও নারায়ণদাস গণক কুচীতে থাকিতেন। মহাকালীরাম মাধবদেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি শুদ্ধমতি বৈষ্ণব ছিলেন। কথিত আছে, একদা মাধবদেবের গৃহাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে থাকিতে ইনি কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন। মহাকালীরাম নানা মনোময় দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন। সর্ব্বাঙ্গে নানা বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া একটি পায়ে খড়ম দিয়াছেন, এমন সময় মাধবদেব আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মহাকালীরাম ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মাধবদেবকে স্নানীয় দিতে গেলেন। গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া মাধবদেব প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীমূর্ত্তির এক পায়ে খড়ম নাই দেখিয়া মাধবদেব, কে এরূপ 'কদর্থনা' করিয়াছে সন্ধান করিয়া সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর মহাকালীরামের সৌভাগ্যের প্রশংসা ভক্ত-সমাজে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

পাটবাউসীতে সত্র স্থাপিত হইলে পর ক্রমে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক গুরুদেব-দামোদর ও হরি গুরু তথায় আসিলেন। দলে দলে লোক শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক সত্রে আসিতেছে। অহোরাত্র কৃষ্ণ-কথালাপ, ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। দলে দলে লোক শক্তিপূজা ত্যাগ করিয়া 'এক শ্রীকৃষ্ণে শরণ' লইতেছে!

প্রথমে শাক্তগণ শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তদিগের উদ্দেশ্যে নানা বিদ্রূপপূর্ণ কবিতা ও ছড়া রচনা করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। শঙ্করদেবও 'পাষণ্ড-মর্দ্দন' নামক কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তনটির ঘোষা বা ধূয়া এই :—

১। কলির ধর্ম্ম হরি নাম জান। পাপীর নিন্দাত নিদিবা কাণ॥
২। হরি ও হরি রাম মুরারি। কীর্ত্তনর নিন্দা সহিতে নারি॥

৩। ত্রাহি ত্রাহি রাম মোরে। মই মজিলো সংসার ঘোরে॥
৪। রাম সে জীবন রাম সে প্রাণ। রাম বিনা নাহি বান্ধব আন॥

এই কীর্ত্তনটি ঐতিহাসিক-হিসাবে খুব মূল্যবান। প্রতিপক্ষের পরাজয়ের জন্য শঙ্করদেব প্রধানতঃ যে সকল শাস্ত্র অবলম্বন করিতেন তাহা এই কীর্ত্তনে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্তের মর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এই কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চাৎ একাদশ স্কন্ধ, আগম, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, সূতসংহিতা, চতুর্থ স্কন্ধ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ, ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তনের একটি উপদেশ এই :—

পুরাণ সূর্য্য মহাভাগবত। বেদান্তরো ইতো পরম তত্ত্ব॥
আক কুবুদ্ধি ফুরে নিন্দা করি। তার মুখ চাই বুলিবা হরি॥

আর একটি—

বিষ্ণু বৈষ্ণবক করে ধিক্কার। কাটিবে আণ্টিল জিহ্বাক তার॥
শাস্তি করিবাক যেবে না পারি॥ গুচিবে কাণিত অঙ্গুলি গারি॥

ক্রমে বিপক্ষবাদীরা এই দিকে কিছু করিতে না পারিয়া অন্য উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা বিদ্বেষ করিয়া শঙ্করদেবের বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, কারণ শঙ্করদেব তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক শাস্ত্রদর্শী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। আর আহম রাজগণ ব্যক্তিগতভাবে শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। এবার প্রতিপক্ষগণ অতি অল্পায়াসে শঙ্করদেব ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি রাজার বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে সমর্থ হইলেন। শঙ্করদেবের কঠোরতর পরীক্ষার কাল উপস্থিত হইল।

কোচবংশীয় নৃপতিরা শাক্ত-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নরনারায়ণ রাজার পিতা বিশ্বসিংহের সময়েই কামাখ্যাদেবীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত ও তাঁহার পূজা-সেবার ঘটা অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজা নরনারায়ণের নিকট শাক্তেরা যখন জানাইলেন যে, শঙ্করদেব দেবীর পূজা নিষেধ করিয়াছেন তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি শঙ্করদেবকে ধরিবা আনিতে "গড়মালি" পাঠাইয়া দিলেন এবং আরক্ত-নয়নে বলিলেন :—

চারি গড়মলি যাই আন শঙ্করক। অনাচার করি নষ্ট করিল্ল রাজ্যক ॥
করিব বিচার এহু নিষ্ঠ হই যেবে ॥ ছাইবো দামা সত্যে শঙ্করের ছালে তেবে ॥
নিষ্ঠ করি বোলো মাংস হেঙ্গালে খুয়াইবোঁ। শঙ্করের হাড়ে নিষ্ঠে অগনি পুরাইবো ॥

দেওয়ান চিলারায় শঙ্করদেবের হিতৈষী ছিলেন।* ইনি বৈষ্ণবদিগের প্রতিও প্রীতিভাবাপন্ন ছিলেন। ইঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া শঙ্করদেব "সীতাসয়ম্বর নাটক" রচনা করেন। শঙ্কদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দকে ইনি রাজ-সরকারে একটী কর্ম্মও দিয়াছিলেন। দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন, স্বয়ং শঙ্করদেব—

কতো দিন ঘরে আছিয়া শঙ্করে বেহারক লাগি গৈ।
আসিলন্ত যাই চিলা রায় ঠাই কারখানার দলৈ হৈ ॥

ইহা কিরূপ কারখানা স্পষ্ট বুঝা যায় না। কিন্তু ইহা শঙ্করদেবের অর্থাগমের একটী উপায় ছিল। তিনি পাটবাউসী হইতে প্রত্যহ তাম্তিকুচি স্থিত এহ কারখানায় যাইতেন। শঙ্করদেবকে ধরিয়া আনিবার জন্য কঠোর রাজাদেশ প্রচার হইবামাত্র শঙ্করদেব, পুত্র রামানন্দ ও চিলারায়ের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন এবং রাজ-প্রেরিত গড়মলি আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তাঁহাকে না পাইয়া গড়মলিরা ভক্তনারায়ণদাস ও গোকুল চাঁদকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভক্তদ্বয় হরিনাম করিতে করিতে বন্দীভাবে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। "শঙ্করদেব কোথায় ?" পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াও ইঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ইঁহারা সত্য-গোপন করিতেছেন মনে করিয়া রাজা ইঁহাদের প্রতি উৎপীড়নের আদেশ করিলেন। নয়নানন্দ কোটোয়াল ইহাঁদিগকে লইয়া গেল ; চারিজন খাঁড়াধারী লোক ইঁহাদের উপর বহু অত্যাচার করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন কোটোয়াল রাজাকে জানাইল ইঁহারা শঙ্করদেব কোথায় প্রকৃতই জানে না। যে গড়মলি ইহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছিল সে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিল :—

যেতিক্ষণে আমি নারায়ণক ধরিলো। এক অক্ষর দর্প বাণি মু শুনিলো ॥
শঙ্করর বার্ত্তা আরু শোধয় আমাত। পলাইবার শুনি খেদ করে অসংখ্যাত ॥

ইঁহাদের সরলতার এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার ক্রোধ কিছু প্রশমিত হইল,

* ইনি শঙ্করদেবের ভ্রাতুস্পুত্রী রামরায়ের এক কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি ইহাদিগকে শঙ্করদেব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। (৩৯) ইহারা দুর্গা নাম গ্রহণ করে না, দেবীর পূজা করে না জানিয়া নৃপতি পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া বিস্তর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ইহাদিগকে দেবী-প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই দৃঢ় কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তদ্বয় নির্ভয়ে অসংকোচে রাজার মুখের উপরেই বলিলেন :—

কৃষ্ণত শরণ পশি আবে কেনে অনেক মাথা দঞাইবোঁ।

এই কথায় রাজ-ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি অর্পিত হইল। রাজা ইহাদিগকে প্রহার করিতে গড়মলিকে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ জমাদারেরা ভক্তদ্বয়কে লইয়া গেল। বাঁশের গড়কা লাগাইয়া নিষ্পেষণ করিতে করিতে ভক্ত নারায়ণ দাসের একটী হাত ভাঙ্গিয়া গেল।

তভোঁ নাহি দুঃখ সহসিত মুখ হরি বলি দেন্ত ডাক।

'অঠার জোড়া কঠা' ভক্তদিগের দেহ নিষ্পেষণ করিতেছে, আর ভক্তদ্বয় কি করিতেছেন? তাঁহারা উন্মত্তবৎ—

রামনাম গান্ত কৌতুক করন্ত কতো হে গীত গায়ন্ত।
প্রেম উপজয় গাব শিহরয় কান্দন্ত কতো হাসন্ত॥
কতো বাগড়ন্ত উঠিয়া নাচন্ত ফুরন্ত কতো লব্‌ড়ে।
অষ্টাদশ জোর কঠা ঝাত করি শোলকি আপুনি পড়ে॥

মূঢ় ধর্ম্মদ্বেষিগণ! ভগবদ্ভক্তের বাহ্য দেহের উপর অত্যাচার করিতে পার, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় প্রহারে বিদ্ধ করিবে কিরূপে? ইঁহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজা ও রাজ-পরিষদেরা বিস্মিত হইলেন। রাজা স্বয়ং আর নিপীড়ন না করিয়া ইঁহাদিগকে ভুটিয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কারণ

(৩৯) 'রত্ন-চূড়ামণি' নামক এক হস্তলিখিত পুঁথিতে আছে ভক্তনারায়ণদাস ও উদার-গোবিন্দকে রাজসভায় ধরিয়া নিয়া গিয়াছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই (১) শূদ্র হুয়া গুরুনাম লৈছে। (২) ভাগবত পড়য় তাহার মূল ভাঙ্গি পদ করিছে। (৩) শূদ্র হুয়া সৎসঙ্গ দিয়য়। (৪) তপ যপ যাগ যজ্ঞ ন করয়। (৫) বেদ আরু গঙ্গা তুলসী না মানে। (৬) ব্রাহ্মণর নির্ম্মাল্য ন লয়য়। (৭) মনুষ্যক ভকত বুলি হরিকো অধিক দেখয়। (৮) প্রতিমা না মানে। (৯) অন্ত্যজাতিকো ভক্তি ও জ্ঞান দিয়য়।

তাহা হইলে এই দৈত্যপুরীর প্রহ্লাদ দুটি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে নিঃসংশয়রূপে বিদূরিত হইবে।

নারায়ণদাস ও গোকুলচাঁদকে সুপুষ্ট ও সুন্দরদেহ দেখিয়া ভুটিয়ারা সানন্দে লইয়া গেল। ভক্তদ্বয় বিপদভঞ্জন হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ভুটিয়াদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইহাদের জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাব ভুটিয়ারা সহ্য করিতে পারিল না। কথিত আছে পথে নানা দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া ইহাদিগকে 'দেব মানুষ' মনে করিয়া ভুটিয়ারা ফিরাইয়া দিয়া গেল। মধু ও হরিনামক দুইজন প্রহরী ভুটিয়াদের নিকট হইতে ভক্তদ্বয়কে লইয়া রাজাদেশ অপেক্ষায় এক বাজারে রহিল।

ভক্তদ্বয় অহর্নিশি হরিধ্বনি করিতেছেন। বাজারের লোক ইহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল :—

দুইর দুইত প্রাতি নামত একান্ত মতি
থাকে দুয়ো হরিগুণ গাই।
অনেক দোকানীগণে বেরি আসি সেইখানে
থাকে রঙ্গে দুই হস্তকো চাই॥
কতোক্ষণ চাহি আছি মাথার নামায়া পাচি
যাত যিবা বস্তু আছে জানি।
চাউল ডালি বাঙ্গন মৎস্য খড়ি তৈল লোণ
আগত পেল্লাই দেই আনি।

রাত্রিতে দৈবাৎ নারায়ণ দাসের পদ-শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। নারায়ণ দাস টের পাইয়া হরিকে ডাকিয়া তুলিলেন এবং কহিলেন "আমার পায়ের শৃঙ্খল খসিয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া লাগাইয়া দাও।" বন্দীর এইপ্রকার সাধুতা দেখিয়া হরির চিত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রিতেই সে স্বপ্ন দেখিল, ভক্তের উদ্ধারকারী হরি শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মহস্তে আবির্ভুত হইয়া ভক্তদ্বয়কে অভয় দান করিতেছেন। মধুও রাত্রিতে সেইরূপ স্বপ্ন দেখিল। পরদিবস হরি ও মধু নারায়ণদাসের পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিল এবং

পূর্ব্বর স্বভাব সমস্তে এড়িয়া নিশ্চয় করিয়া মন।
গুণ-চিন্তামণি পুথি আগে থৈয়া কৃষ্ণত লৈলা শরণ॥

এদিকে শঙ্করদেব রাজভয়ে পরিজনদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া একাকী দেওয়ান চিলারায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান কহিলেন "যদি আপনি পণ্ডিতদিগকে নিরস্ত করিতে পারেন, আমি রাজার কোপানল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব।"

শঙ্করদেব কহিলেন "পণ্ডিতদিগকে আমার অণুমাত্র ভয় নাই, কিন্তু রাজা অন্যায় করেন বলিয়াই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।" দেওয়ান শঙ্করদেবকে আশ্রয় দিয়াছেন একথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি শঙ্কর-দেবকে রাজসভায় পাঠাইয়া দিতে দেওয়ানকে অনুরোধ করিলেন।

রাজা নরনারায়ণ প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তাও কম ছিল না; তিনি প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার সভা ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীতে পূর্ণ ছিল। শঙ্করদেবের পণ্ডিতজনোচিত সম্ভ্রমব্যঞ্জক শান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনমাত্র তিনি তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন। স্বয়ং সিংহাসন হইতে নামিয়া চৌরাঘরে আসিয়া বসিলেন এবং আলাপ করিবার জন্য শঙ্করদেবকে তাঁহার সন্নিহিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজা যে 'চৌরা ঘরে' বসিলেন তাহার ভিটি তিন হাতেরও অধিক উচ্চ। ঐ ঘরে উঠিবার জন্য সাতটি 'খটখটি' অর্থাৎ ধাপ। শঙ্করদেব এক-একটি ধাপ উঠিতে লাগিলেন এবং রাজ মাহাত্ম্য-নির্ণায়ক এক একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৃহে উঠিয়া রাজ-সকাশে "মধুদানব দারণ দেবরং" সুললিত তোটকচ্ছন্দে রচিত এই স্তব পাঠ করিলেন। রাজা তাঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে কম্বল-আসনে উপবেশন করিতে কহিলেন। এইরূপে শঙ্করদেবের সমাদর করিয়া রাজা তাঁহাকে সেই দিনের জন্য বিদায় করিলেন।

পরদিবস পণ্ডিতগণসহ বিচারের জন্য সভা আহূত হইল।

ব্রাহ্মণ সকলে শ্লোক গোটেক পঢ়ন্ত। সরাসরি দশোটায়ো শঙ্করে তোলন্ত॥

দুঃখের বিষয়, এই সকল বিচারের বিষয়গুলি কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। বুঢ়াভাষ্য নামক এক পুঁথিতে কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। ঐ পুঁথি শঙ্করদেবের পৌত্র পুরুষোত্তম ঠাকুরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। এই পুঁথির বিবরণ সম্পূর্ণ কল্পিত। কারণ ইহাতে লিখিত আছে "পুরাণ সংখ্যা কত?" এই প্রশ্নের

উত্তরে পণ্ডিতেরা অষ্টাদশ পুরাণ নির্দ্দেশ করিলে পর শঙ্করদেব অষ্টাদশ সহস্র-পুরাণ-সংখ্যা স্থির করিয়া কয়েক হাজার নাম আবৃত্তি করিলেন।

শঙ্করদেবের সহিত বিচারে সভাপণ্ডিতেরা পরাজিত হইলেন। রাজা নরনারায়ণ পরম প্রীত হইয়া শঙ্করদেবকে কহিলেন "আমি কতকগুলি শব্দ বলিতেছি এই গুলি একত্র করিয়া অর্থযুক্ত শ্লোক রচনা করিতে হইবে। আমি স্বয়ং এই শব্দগুলি দ্বারা আটটি শ্লোক রচনা করিতে পারি।" শঙ্করদেব একটী একটী করিয়া সাতটী শ্লোক রচনা করিয়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কহিলেন "আমি এই সকল অর্থ নিজেও কল্পনা করি নাই। যাহা হউক, আরও যতপ্রকার হয় আপনি রচনা করুন।" শঙ্করদেব সানুনয়ে বলিলেন "আমার আর এতাধিক শক্তি নাই। এই পর্য্যন্ত যাহা করিলাম তাহাও আপনার অনুজ্ঞা বলেই করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিলেন যে শঙ্করদেব আরও শ্লোক রচনায় সমর্থ হইয়াও শুধু রাজসম্ভ্রম রক্ষার জন্য আর অধিক অগ্রসর হইতেছেন না। তাঁহার এইরূপ ঔদার্য্যে রাজা নরনারায়ণ অধিকতর পরিতুষ্ট হইলেন। সেইদিন হইতে তিনি শঙ্করদেবের গুণের অতিশয় পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

পশ্চিম হইতে এক পণ্ডিত রাজা নরনারায়ণের সভা জয় করিতে আসিলেন। তিনি এক এক দেশ জয় করিয়া তাহার নিদর্শন স্বরূপ হস্তে এক একটী বলয় ধারণ করিতেন। তাঁহাকে প্রভূত তেজসম্পন্ন দেখিয়া রাজা নরনারায়ণ বলিলেন "আমার সভায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা আপনাকে পরাস্ত করিলে আমার বিশেষ পৌরুষ নাই; আমি শূদ্র দ্বারা আপনাকে বিচারে যদি পরাস্ত করিতে পারি তবেই নিজকে প্রকৃত গৌরব-ভাজন মনে করিব।" বিচারের দিন স্থির হইল, পণ্ডিত বাসা করিয়া অপেক্ষায় রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ শঙ্কদেবের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তিনি কিরূপ পণ্ডিত দেখিতে আসিলেন। কথায় কথায় তাহারা শঙ্করদেবকে বলিল "শূদ্রের ভাগবত পাঠে অধিকার নাই।" শঙ্করদেব এ কথা অস্বীকার করিয়া প্রমাণ দেখাইলেন (৪০) ব্রাহ্মণে ভাগবত পড়িলে ব্রহ্মত্ব লাভ হয়,

---

(৪০) শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম অধ্যায় তৃতীয় স্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায় ৬৫-৬৯ শ্লোক দেখ।

ক্ষত্রিয়ে পড়িলে রাজ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বৈশ্যে পড়িলে ধনবৃদ্ধি হয়, আর শূদ্রে পড়িলে সমস্ত পাপ হইতে ক্রত মুক্ত হয়।" শঙ্করদেব এক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কহিলেন "তবে দ্বিজবন্ধুরা বেদ-পাঠ করিতে পারেন না।" তাহারা একথা মানিয়া লইলে শঙ্করদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "দ্বিজবন্ধু কাহাকে বলেন?" উহারা ভাবিয়া একটা অর্থ বলিল। শঙ্করদেব কহিলেন "এই অর্থও হয়, কিন্তু দ্বিজবন্ধু শব্দের আরও অর্থ আছে।" আর কি অর্থ আছে, উহারা জানিতে চাহিলে শঙ্করদেব কহিলেন "তাহা আমি বলিয়া দিব কেন? আপনারা বলুন, না পারেন পরাজয়-স্বীকার করুন, আমি অন্য অর্থ বলিয়া দিতেছি।" উহারা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব, এই বলিয়া চলিয়া গেল। গুরুদেব দ্বিজবন্ধু শব্দের ফাঁকিতে পড়িয়া পরদিবস পলায়ন করিলেন। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

তৎপর দিবস হইতে শঙ্করদেব প্রত্যহ রাজভবনে যাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার এরূপ বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, কথিত আছে তিনি শঙ্করদেবের নিকট হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু শঙ্কর রাজা ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোককে দীক্ষা দান করিতে সম্মত হন নাই।

ইহার পর তিনি কখন রাজধানীতে কখন পাটবাউসীতে এবং কিছুকাল তীর্থভ্রমণে যাপন করিয়াছিলেন। রাজানুগ্রহ-লাভের পরে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারে আর বাধা রহিল না। দ্রুতগতিতে হরিনাম-ধ্বনি সমগ্র আসামময় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে, হেড়ম্বরাজ দীক্ষা-গ্রহণ-মানসে শঙ্করদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলে মাধবদেব ও নারায়ণ দাস প্রেরিত হন। ইঁহাদের উপদেশে রাজা বলিদানের জন্য রক্ষিত নয়জন বন্দীকে মুক্তিদান করেন।* এই হেড়ম্বরাজ কোন দূরবর্ত্তী কাছাড়ী রাজা হইতে পারেন। ফলতঃ শঙ্করদেবের প্রচার-ফলে আসামে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বহুদূরব্যাপী ও সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মাধবদেব স্বরচিত গুরুভটিমাতে লিখিয়াছেন :—

পণ্ডিত মানীবেদ বাখানি গরব কয়লি সব চুর।
গীত কবিত্বগুণ শঙ্করদেবের কীরিতি গয়ো বহুদুর।